প্রকৃতিপাঠ

প্রকৃতিপাঠ

কিন্নর রায়

সমকাল প্রকাশনী
৮/২ এ গোয়ালটুলি লেন
॥ কলকাতা-১৩ ॥

প্রথম প্রকাশ :

নববর্ষ : ১৩৭০

এপ্রিল : ১৯৬৩

প্রকাশক :

প্রসূন কুমার বসু

সমকাল প্রকাশনী

৮।২এ, গোয়ালটুলি লেন

কলিকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :

গৌতম রায়

মুদ্রাকর :

মথুরা মোহন দত্ত

মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস

৭০, ডবু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

শ্রীমতী নীহারকণা সরকার
শ্রী প্রশান্ত সরকার
যাঁদের ছায়া আমাকে সবুজ
রাখতে চায়

রাতে প্রকৃতির একটি নিজস্ব রং ফুটে ওঠে। সতীপ্রসন্নর ষাট পেরনো অভিজ্ঞতায় এ সত্যটি বহুদিন। আজ মহাবীরতলা থেকে অটো রিকশার পেছনের সিটে বসে সতীপ্রসন্ন রাতের প্রকৃতির নিজস্ব বর্ণমালা দেখতে থাকলেন। আষাঢ় শেষ হয়ে এলো। এ বছর এখনও তেমন করে ঝামরে বর্ষা নামেনি। তবু আকাশে চকিত মেঘ হঠাৎ ভেঙে পড়ায় দ্বিতীয় ঋতুর আলাপ, বৃষ্টি হলেও গরম কাটে না।

একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পেরিয়ে আসা রাস্তার খোঁদলে কাদামাখা জল। মহাবীরতলার হনুমান মন্দিরের গা-লাগোয়া অটো স্ট্যাণ্ডটি পেরনোর পর ডানদিকে দুটি বড়সড় রুটি-তড়কার দোকান, ম্যাগাজিন স্ট্যাণ্ড। রাস্তা জুড়ে থাকা বাতিল অথবা সচল—কিন্তু এখন থেমে আছে, এমন লরি। তিন চাকার টেম্পো, আর তারপরই ভাটিখানার দিশি-মদের ঝাঁঝ বাতাসে ভাসে। ইদানীং গাড়ি, বিশেষ করে টু হুইলার আর অটো রিকশা বেড়ে যাওয়ায় রাস্তা পেরোতে পেরোতে অনেকগুলি গতি নিরোধক বাম্প। গোটা দুই ওষুধের দোকান, বাপুজিনগর টাউন কংগ্রেস অফিস, উল্টো দিকে ইন্দিরা গান্ধীর স্মরণে স্মৃতিবেদী, টাউন কংগ্রেস অফিসের আগে খালি বস্তার গোডাউন, ময়লা ডাম্প করার সিমেন্ট ঘেরা জায়গা। রিকশা স্ট্যাণ্ড। ডান দিকে ঢুকে যাওয়া পাকা রাস্তা। এবং কলাবাগান আসার আগে বাঁ-দিকে মোষ রাখার বিশাল খাটাল। পাশে পাঁচিল ঘেরা চৌকো জমি। ঠাকুর তৈরির শেড, সেখানে এখন বিশ্বকর্মা তৈরি হচ্ছে। একমেটে দোমেটের পর নানান মাপের মূর্তিরা আলোয় আঁধারে কখনও কখনও যেন এ গ্রহের নয়।

কলাবাগান পেরতে পেরতে বাঁদিকে দুটো মিষ্টির দোকান থেকে আসা টিউবের আলো কালো রাস্তায় ডুবে যাচ্ছে। তারপর বিজলি

গ্রিলের কোল্ড ড্রিংকস্ কারখানা। তার হলুদ দেয়ালে অরবিন্দ এবং বিবেকানন্দের রঙিন মুখ। আর একটি বাণী, যা সতীপ্রসন্নের মনে পড়ে —আমি সিংহের হৃদয় ধ্যান করি—এবং সঙ্গে আরও অনেক সুভাষিত বাক্যাবলী, যা কিনা মহাপুরুষ মুখনিঃসৃত বলে চিহ্নিত। ফলে অন্য কোনো রাজনৈতিক দেয়াল লিখন নেই।

সিরিটির শ্মশান আসার আগে বাঁ-দিকে অনেকটা নিচু জমি। সেখানে বর্ষার জল জমে জমে দিঘীর মাত্রা পেয়ে যায়। উথাল-পাতাল মাছ শিকার সেই জলে। খ্যাপলা জালের আস্ফালন। পেশী ও পরিশ্রমী শরীরের ছন্দে জলের রুপোলি শস্য উঠে আসে। এবং চৈত্র বৈশাখে আকাশ মাটি রোদে-তাতে ধূলি ধূসরিত হয়ে উঠলে এই জলা-ভূমি নিচু মাঠ হয়ে যায়। অনায়াসে লরি বা মাটাডোর রাস্তা থেকে গড়িয়ে নেমে, নাবি জমি পেরিয়ে ওপারে গিয়ে ওঠে। ভারি চাকার দাগের সঙ্গে ধুলো ওড়ে। সেখানে এখানে ওখানে জমা জলে মেঘের ছায়া, পাখির ডানার রং। জল শুকিয়ে গেলে কাদার ভেতর মোষেদের গা ডুবিয়ে বসে থাকা। জল থাকলেও সেখানে শুধু গলা-মুখটুকুই আকাশের দিকে তুলে রাখা গৃহপালিত, খাটালবাসী মহিষ যূথ। তাদের শিঙে জড়িয়ে থাকা সবুজ কচুরিপানা, ময়ূর পেখম রঙের কচুরিফুল, তেলাকুচো লতা, কখনও ব্যস্ত ফিঙে পাখি।

সিরিটি শ্মশানের আগে, এই নিচু জমিটিতে শীত পড়ার আগে সবুজ কচুরিপানা, ময়ূর পেখম রঙের ফুল, শরতের কাশফুল। এপারে পিচের রাস্তা, আর জমি পেরিয়ে ওপারে গেলে ঘন বিন্যস্ত সবুজ, কলাঝোপ। টালির চালঅলা মাটির একতলা।

নিচু জমির আগে পিচ রাস্তার গায়ে ডাঙার ওপর নীল প্লাস্টিক শিটে মানুষের গেরস্থালী। উল্টোদিকে জ্যামজেলি আচারের কারখানা। বৃষ্টি পড়লে আনারসের খোলা, ছিবড়ে পচে বাতাসে যে গন্ধ ছড়ায়, তাতে কিছু না কিছু মাদকতা থেকেই যায়। কোল ইণ্ডিয়ার ঘেরা জমি পেরিয়ে, লরির যাওয়া-আসা দেখতে দেখতে এখানে পৌঁছে যাওয়া যেতে পারে।

পিচ রাস্তার পারে, শ্মশানের উল্টোদিকে, যে বিস্তীর্ণ ইটখোলার জমি ছিল, তা ইটের পাঁচিল তোলার পর বাড়ি তৈরির ছোট এবং মাঝারি প্লট। মানুষের ফ্ল্যাট ও জমির খিদে ইদানীং বেড়েছে। প্লটগুলির পেছনে পি. এন. মিত্রের নিচু ইটখোলার জমি। এখন ইট তৈরি হয় না। মাটি তুলে নেয়ার পর যে গর্ত, সেখানে বর্ষার জলে বড় পুকুরের মায়া।

সিরিটি শ্মশানে ঢোকার রাস্তায় 'সাক্ষাৎ বামদেবের শিষ্য', কোনো প্রাচীন যাদুকরের নাম আছে। বড়, চৌকো টিনের বোর্ডের ওপর তাঁর নাম, এই শ্মশানে গড়ে ওঠা তারা মন্দিরের কথা এবং উৎসবের তিথিগুলি লেখা আছে। বাঁ-দিকে শ্মশানের গলিটি ঢুকে গেছে। সেই গলির পরই, বড় রাস্তার গায়ে একটি চায়ের দোকান। তারপর আনন্দমার্গীদের বন্ধ স্কুল, স্টেশনারি দোকান। উল্টোদিকে মন্দির। বালতি, হারিকেন, ট্রাঙ্ক সারানোর শিশু শ্রমিক, সেলুন, ছুরি-কাঁচি শান দেয়ার দোকান। তারও পরে চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান।

করুণাময়ী বাজার, বাস স্ট্যাণ্ডের দিক থেকে নর্দমা তৈরির জন্যে মাটি কাটতে গিয়ে প্রায় এক মানুষ সমান রাস্তা খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে শালের তক্তা পোঁতা, খুঁটি।

পিনকোডে কলকাতা, অথচ অভ্যাসে-সুযোগে কলকাতা নয়, এমন অঞ্চলটিতে এখন পাতাল থেকে উঠে আসা কাদায় রাস্তা দুর্গম, পিছল। গত বর্ষায় গোটা বীরেন রায় রোড খুঁড়ে পাইপ বসানোর কাজ হয়েছে। রাস্তার নিচে থেকে উঠে আসা কাদায় বৃষ্টির জল পড়ে পা রাখা যেত না। কোনো বিদ্যুৎহীন রাতে সেই রাস্তায় পা ফেলতে গেলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল। বন্ধ ছিল একুশ নম্বর বাস। খোঁড়া রাস্তা, কাদায়, জমে থাকা উঁচু মাটির স্থাপত্যে, পুঁতে রাখা কাঠের তক্তার মায়ায় এই রাস্তার ভূগোল বদলে গেছিল।

সিরিটির মোড়ে অটো থেকে নেমে সতীপ্রসন্ন একটি কয়েন দিলেন, এক টাকার ধাতুমুদ্রা। মোড়ের দোকানটিতে বছরখানেক আগেও শুধু সাইকেল, হাল্কা টু-হুইলার সারানো হতো। সঙ্গে টেপ

রেকর্ডার, রেডিও। এখন 'আবিস্কার'—এই ভুল বানানে দোকানটির নতুন নাম। সেখানে একপাশে টেলিভিশন রেডিও টেপ রেকর্ডার সারানোর আয়োজন। আর এক পাশে কাচের বাহারি শো কেসে সন্তোষ টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেট এবং বক্সে 'হাওয়া হাওয়া ও হাওয়া খুশবু লুটা দে'। সতীপ্রসন্ন শুনলেন হাবা হাবা ও হাবা—।

এই আবিষ্কারের উল্টোদিকে (ঠিক বানানটিই এখন থেকে লিখব) বঙ্গলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। সেখানে কোল্ড ড্রিঙ্কস, নানা ধরনের মিষ্টি। ইদানীং রোল, চাউমিন, আর আরও নানাবিধ ফাস্ট ফুডের দাপটে মিষ্টি খাওয়ার চল কিছু কমেছে। মিষ্টির দোকানের গায়েই চাকাঅলা রোল, চাউমিনের গাড়ি। বাতাসে ডিম ভাজার আঁশটে গন্ধ।

বঙ্গলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের টিউব-ঝলক 'আবিষ্কার'-এর আলো রাস্তার ওপর চলকে পড়েছে। 'আবিষ্কার'-এর পাশে 'আনন্দময়ী হিন্দু হোটেল'। এখানে এখনও তিন টাকায় ডিমের কারি, ডাল-ভাত-তরকারি। একটি রুটি পঁচিশ পয়সা। আনন্দময়ী বাঙালি হিন্দু হোটেলে ফ্রিজ আছে—কোল্ড ড্রিংকসের আয়োজন। আর বামাক্ষ্যাপা ও তারাপীঠের মূর্তির ছবি। লোল জিহ্বা দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় বিদ্যাটির গলায় রক্ত জবার মালা।

এরই গা-লাগোয়া দেয়ালে 'দাসী স্টোর্স'—সেখানে পান বিড়ি সিগারেট। তারপরই ডান দিকে সিন্নিটি শুকতারা সংঘ।

সিন্নিটির মোড়ে নেমে সোজা হাঁটতে গেলে এখন যে রাস্তা, তা এই বর্ষা ঋতুতে কিছু দুর্গম। রাস্তার এ-গর্তে ও-গর্তে জল।

পায়ে ফিতে বাঁধা স্যাণ্ডাক। ধুতি হাঁটুর কাছে তুলে সতীপ্রসন্ন হাঁটছিলেন। একটু আগের বৃষ্টি বাতাসকে কিছু ঠাণ্ডা আমেজ দিয়েছে। আর আকাশ থেকে, নাকি কোনো গাছের পাতা থেকে টাকের ওপর টপ করে খসে পড়া এক বিন্দু জলে তাঁর চমকে ওঠা। শিহরণ মাথা থেকে সারা গায়ে। ডান দিকের ফাঁকা মাঠে, যেখানে অবিরাম যাত্রা, অথবা ভি, ডি, ও শো, নয়তো দশ রাত্রি ব্যাপী

বোম্বাইয়া-তাণ্ডব, সেখানে তাঁবু ফেলে রাস্তা খোঁড়ার আয়োজন। লোহার পাইপ, ইট খোয়া।

কিছুদিন আগেও অন্ধকারে রাস্তার গর্ত, পোঁতা শালবল্লা এবং তক্তার মায়ায় কোনো বৃষ্টির রাতে যে ভাঙা জাহাজের মায়া ফুটে উঠত সতীপ্রসন্নর সামনে, তা ইদানীং অনুপস্থিত। ভয়াবহ পেছল পথ, কাদা, ইলেকট্রিক আলোর অনুপস্থিতি—সবই মানুষের নাগরিক অস্বস্তির পরিমাণ বাড়িয়েছে। এবং এখন এই পাঁচিল ঘেরা ফাঁকা মাঠের গায়ে, বঙ্গলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের প্রায় বুকের ওপর ফোর সি রুটের একটি অন্ধকার লাল বাস। একতলা সরকারি গাড়িটি এ রাতে আর ছাড়বে না।

কাদা বাঁচাতে ধুতি তুলে দু'পাশের বাড়ি, পাঁচিল, ডেকরেটরের দোকান, ভাতের হোটেল, সবজি বিক্রির চালাঘর—সব পেরতে পেরতে তাঁর মনে পড়ল স্টুডেন্টস হলে আজকের মিটিংয়ের কথা। জীবনে মানুষ একলা কি-ই বা বা করতে পারে! সংগঠনে, সম্মেলনে, সমবেত উদ্যোগে মানুষ এগোয়—একটা বিশ্বাস এখনও আছে সতীপ্রসন্নর।

রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে সবগুলো আলো কখনই জ্বলে না। পাঞ্জাবির পাশ পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বাললেন সতীপ্রসন্ন। ব্যাটারি কমে এসেছে। রাস্তার অসমান বুকে লালচে আলোর গোল মতো অন্ধকার-তাড়ানিয়া প্রয়াস। তাতে আঁধার তেমনভাবে কাটে না। কিন্তু এ আলোর বিভ্রমে বিশ্বাস আসে।

নবতরুণ সংঘের অ্যাসবেস্টার ছাওয়া ক্লাব ঘরে এখনও ক্যারাম অথবা তাসের আয়োজন। তারপর ডানদিকে ঘুরতে গেলেই যে দুটি বিশাল ঝাড়ালো সবুজ, তার ডালে ডালে এখন শুধুই পাতা। পাউডার পাফ চেহারার ফুলেরা মাস দুই আগেই নিরুদ্দেশ। তাদের স্বর্ণবর্ণ সরু পাপড়িতে কি যে সুগন্ধ জড়ানো ছিল! আর বাঁক নেয়ার মুখেই ফাঁকা মাঠের ওপর অন্ধকারে ভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিবেকানন্দ-মঞ্চটি দেখতে পেলেন সতীপ্রসন্ন। বছরে একবার

দুর্গাপুজো থেকে লক্ষ্মীপুজো, এই টানা প্রায় এক সপ্তাহ সেখানে ধারাবাহিক বিদ্যুৎমালা, কলকণ্ঠ। সেভাবেই বাৎসরিক নিয়মে, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যায় সেখানে কোনো নাটক, আবৃত্তি গানে গানে বক্তৃতায় সংস্কৃতি-মনস্কতার উৎসব। হয়ত কিছু যৌবনের হুজুগও। আর কিভাবে যে এই তিন প্রতিভাবানকে একসঙ্গে স্মরণ করার শর্টকাট পথ আধুনিক বাঙালি প্রজন্ম আবিষ্কার করেছে, সুধাপ্রসন্ন বুঝতে পারেন না।

ডানদিকে পুকুরের গাঢ় সবুজ জলে প্রকৃতির কিছু অন্ধকার ভেসে আছে। পাশের কোনো বাড়ির খানিকটা টিউব-জ্যোৎস্না চলকে এসে পড়েছে পুকুরের বুকে। হঠাৎ দেখলে বুঝি বা চাঁদের বিভ্রম। এবং এরপর সরু গলিপথ, বাঁ-পাশে ইলেকট্রোপ্লেটিং, অ্যানোডাইস করার কারখানা পেরিয়ে ডান হাতে আরও লম্বা পুকুর ছাড়িয়ে দু'সারি বাড়ির মাঝখানে গত বছর সিমেন্টে বাঁধানো হয়েছে এমন সংকীর্ণ রাস্তাটিতে এসে পৌঁছন সতীপ্রসন্ন।

ডানদিকের বেঁটে পাঁচিলে আকাশের আলো, বোধহয় অন্ধকারের কোনো নিজস্ব রং লেগেছে। সিরিটির মোড়ে অটো থেকে নামার আগে তিনি রাতের যে নির্দিষ্ট রং নিয়ে ভাবনায় ছিলেন, তা আবার মনে পড়ে গেল। সেই রং-কে তিনি যথার্থ অর্থেই অনুভব করলেন এই পাঁচিলের গায়ে। যেখানে দিনের আলোয় দেখা যাবে বর্ষার জল লেগে বেড়ে ওঠা কিছু সবুজ শ্যাওলার বাহার। আজকাল এরকম অনেক কিছুই ভুলে যান সতীপ্রসন্ন। হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে গেলে তাড়াতাড়ি জোড়াতালি দিয়ে বিষয়টিকে নিজের মনের ভেতর গেঁথে ফেলেন। দু'তিনবার ঠোঁট বিড়বিড় করে, আপন মনে কথা বলেন। আর নয়তো অন্যের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যে প্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছিল না, অথচ অনেকক্ষণ বাদে মনে পড়েছে, তাকে আলটপকা বলে ফেলা। যার সঙ্গে চলতি আলোচনার কোনো সঙ্গতিই নেই। অন্য যাঁরা আলোচনায় ছিলেন, তাঁরা এমনতর প্রসঙ্গ পরিবর্তনে কিঞ্চিৎ বিব্রত হন। সতীপ্রসন্ন ব্যাপারটা বঝতে পারলে ভেতরে

ভেতরে অস্বস্তিতে পড়েন। এবং নিজেকে সামলে নিতে দ্রুত কথা পাল্টান।

সিমেন্ট বাঁধানো এই সংকীর্ণ গলিপথে আকাশের চোরা আলো তার নিজস্ব ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। ডান পাশের একতলা বাড়ির নিচু পাঁচিলের ওপাশে পাতাবাহারের সবুজ। তার ওপরে আবার একটা ডোবা, ডানদিকে একটি গাছ তার নিজস্ব মাত্রায় দাঁড়িয়ে। আপাততঃ সেটি গোরুর গলার দড়ি বাঁধার খুঁটি। অন্ধকারে গোরুর চোখ জ্বলে। যেন বা কোনো উজ্জ্বল গোলক।

সতীপ্রসন্নর মনে পড়ল অন্তত বছর ছয় আগে মেট্রো সিনেমায় দেখা 'টুথ অ্যাণ্ড ক্ল' ছবির একটি দৃশ্য। আফ্রিকার জঙ্গলের রাত। চিতার তাড়া খেয়ে দৌড়চ্ছে ওয়াইলড বিস্টের পাল। ছোট নদী, ঝোপ-অরণ্য পেরিয়ে তাদের মরণপণ ছুটে চলা। পেছনে ধেয়ে আসা হলুদ-কালো মৃত্যু। অন্ধকারে, প্রকৃতির ফিকে আলোয় সে এক অনন্ত মৃত্যু-দৌড়। সেই গতির সঙ্গে ওয়াইলড বিস্টদের ঝকঝকে চোখ। এই প্রায়ান্ধকার প্রকৃতির নিচে একক গাছের নিচে বাঁধা গোরুটিকে দেখে সতীপ্রসন্নর মনে পড়ল সিনেমার পর্দায় দেখা চোখগুলি।

প্রকৃতিকে ছুঁতে, জানতেই তিনি গেছিলেন 'টুথ অ্যাণ্ড ক্ল'-র দর্শক হিসেবে। যেমন আজও স্টুডেন্টস হলে 'ক্যালকাটা ঃ মাইলাভ'-এর ডাকা সেমিনারে 'পরিবেশ' কাগজের সম্পাদক, প্রিন্টার, পাবলিশার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সতীপ্রসন্ন।

এভাবেই কত কি হঠাৎ মনের ভেতর ভেসে ওঠে, যেন বা এক-টুকরো চলচ্চিত্র। যেমন ইদানীং ঝক ঝকে অফসেটে ছাপা রঙিন কাগজে দূষণ, পরিবেশ পলিউশনের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ধারা-বাহিক সেণ্টার স্প্রেড ক্যামপেন। পরিষ্কার পাহাড়, সবুজের গায়ে পিকনিকের জঞ্জাল, জ্যামের টিন, প্লাস্টিকের প্যাকেট। কিংবা আকাশের ছায়া বুকে নিয়ে তরঙ্গে ভেঙে পড়া নীল সমুদ্রের পাড়ে নানান এলোমেলো ফেলে যাওয়া জিনিস, পলিপ্যাক, যা এই জলকে

দূষণে ভরিয়ে দেবে। নিচে ক্যাপশান—ওরা এসেছিল গাড়ি চড়ে, বা এরকমই কিছু। এ বিজ্ঞাপন অবশ্য পরিবেশ পায় না।

এসব ভাবতে ভাবতেই বাঁ-দিকের ছোট পুকুরটি পেরিয়ে পিচ বাঁধানো রাস্তায় উঠে আসেন। তাঁর বাড়ি থেকে পুকুরের আগে পর্যন্ত রাস্তাটি বাঁধিয়ে দিয়েছে কর্পোরেশন। একটু উঁচু পিচ রাস্তায় উঠে এলে বাড়ির আলো দেখা যায়। ডানদিকে আরও একটি নতুন ক্লাব ঘরের ক্যারামের আলো পেরিয়ে তিনি বাঁ-দিকে ঘোরেন। ঘুরলেই টিনের বেঁটে দরজা। দরজায় শেকল লাগানো ছিল। হাত ছোঁয়াতেই প্রচলিত শব্দ করে খুলে গেল। এই আগলটুকু পেরোতেই দেয়ালে টিনের প্লেটে এ বাড়ির ঠিকানা। তার পাশে কাঠের দুটি লেটার বক্স। একটি 'পরিবেশ'-এর নামে। অন্যটি কেয়ার অফ সুধা-প্রসন্ন ঘোষ। পাশ পকেট থেকে হাতড়ে চাবির গোছা এনে অন্ধকারে চাবি মিলিয়ে ছোট গা-তালা খুলে দেখলেন সতীপ্রসন্ন। 'পরিবেশ'-এর লেটার বক্স থেকে দুটি লেখা ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না।

সতীপ্রসন্ন ঠিক এ মুহূর্তে এ বাড়ির মানচিত্র জানেন। এখন রাত প্রায় নটা। নিচের একতলায় তাঁর থেকে চোদ্দ বছরের বড় বড়দা দৈনিক ছাপার জন্যে সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখছেন। এ পর্যন্ত তাঁর গোটা চল্লিশেক চিঠি শুধু 'স্টেটসম্যান'-এর লেটারস টু দ্য এডিটর কলমে ছাপা হয়েছে। বড়দা সুধাপ্রসন্নর খালি গা, ভালো মিলের খাপি সুতির লুঙ্গি প্রায় বুক পর্যন্ত তোলা। চৌকিতে ছাড়ানো অক্সফোর্ড এবং চেম্বারসের দুটি ডিকশনারি।

বড়দার শরীরে এখনও কোনো বাড়তি মেদ নেই। রোগা ছিপছিপে একহারা চেহারা। সামনের চুল অনেকখানি উঠে গিয়ে কপালকে চওড়া করেছে। সুধাপ্রসন্ন এখন 'স্টেটসম্যান'-কেই একমাত্র কাগজ মনে করেন। তবে অন্যান্য বাংলা ও ইংরেজি কাগজে তিনি বিভিন্ন সমস্যা ও বিষয় নিয়ে পাতার পর পাতা চিঠি লেখেন। সেই সব চিঠি ছাপার জন্যে বিভিন্ন কাগজের অফিসে ঘোরাঘুরি, তদ্বির করতে হয়। এ ব্যাপারে যাওয়া-আসা করতে করতে সব

অফিসেই তাঁর কিছু মুখচেনা মানুষ হয়ে গেছে। তারা তাঁকে বসতে বলে, কখনও চা খাওয়ায়, কখনও কখনও সম্পাদক সমীপেষু বা লেটারস টু দ্য এডিটর-এ লেখার জন্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বলে দেয়।

চিঠি বেরোলেই সুধাপ্রসন্ন সেই কাগজের তিনটি কপি কেনেন। একটির ক্লিপিং তিনি রাখেন নিজের সাবজেক্ট ওয়াইজ ভাগ করা মোটা সোটা খাতার পাতায়, আঠা দিয়ে সেঁটে। একটির ক্লিপিং পাঠিয়ে দেন রাজ্যের সেই মন্ত্রীর কাছে, বিষয়টি যাঁর দপ্তরে পড়ে। অন্যটি এই বিষয়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে। চিঠির বক্তব্য যদি কোনোভাবেই কোনো বিভাগীয় মন্ত্রীর এক্তিয়ারে না পড়ে, তাহলে সেটিকে শুধুমাত্র নিজের বিষয় ভাগ করা খাতায় বিষয় ধরে লাগিয়ে রাখেন সুধাপ্রসন্ন। এ খেলা চলেছে গত তিরিশ বছর ধরে।

বৌদি অপরাজিতা নিশ্চয়ই হরিসভায়, প্রায় নিঃসঙ্গ জীবনের এই সান্ধ্য অভ্যাসটি গত দশ পনের বছরের। নিয়মিত, ধারাবাহিক।

গেট পেরিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে সতীপ্রসন্ন তাঁর চোদ্দ বছরের বড় দাদাটিকে দেখতে পেলেন। আধ ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে যতটুকু দেখা যায়, সেই দৃশ্যমালায় এলো-মেলো বিছানার ওপর চেম্বারস এবং অক্সফোর্ড বেষ্টিত সুধাপ্রসন্ন। অনেকগুলি কলম, কাগজ, আলপিনের কৌটো, জেমস ক্লিপের বাক্স। আজকের 'স্টেটসম্যান' এলোমেলো হয়ে এক পাশে। বুকের নিচে বালিশ। দাদা ডটপেনের পেছন দিকটি কামড়াতে কামড়াতে—একদম যেন ছেলেবেলার প্যারীচরণ সরকার, নেসফিলড বা যাদব চক্রবর্তীতে আছে—ঠিক তেমনভাবেই শাদা কাগজের ওপর ঝুঁকে ছিল।

সুধাপ্রসন্ন এখন সব অর্থেই নিজের জগতে। ও ঘরের বাতাস ভরে আছে বিদেশী চুরুটের গন্ধে। এত বড় বড় করে ইনজুরিয়াস টু হেলথ লিখে ক্যাম্পেন চালানোর পরও মানুষ তামাক-বিদ্বেষী হলো না। সতীপ্রসন্নর অবাক লাগে।

দাদা তিন বছরের কন্ট্রাক্টে যে পাঞ্জাবী পরিবারটিকে দোতলার দুটি ঘর ভাড়া দিয়েছে, সেই অ্যাডভান্স-আনুকূল্য থেকে সতীপ্রসন্নও

বাদ যান নি—সেখান থেকেই ভি. সি. আর-গর্জন ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই কোনো বাজার চলতি অ্যাকশন প্যাক্‌ড্ হিন্দি ছবি। একদম কারেন্ট বই। সঙ্গে সঙ্গে সেক্‌স্ আর ভায়োলেন্সের ঝাঁঝালো মশালা।

ভি. সি. আর-এর উদ্দাম চিৎকারে, নিচে দাদার একাগ্র নীরবতায়, এই প্রায় ফাঁকা বাড়ির মধ্যে নিজের ঘরের চাবি খুলতে খুলতে সতী-প্রসন্ন টের পেলেন রান্নাঘর থেকে ডাল রান্নার স্বাদু ঘ্রাণ ভেসে আসছে। তাঁর মনে পড়ল দুপুরে সেমিনারে বেরনোর আগে মনোরমাকে কাঁঠালের বিচি দিয়ে মুগ ডাল রান্না করতে বলে গেছিলেন।

বাড়িতে লোকজন থাকলেও নিজের ঘরে চাবি দিয়ে বেরোন সতী-প্রসন্ন। ইদানীং মনোরমার হুঁশ-পর্ব কম। তাছাড়া ভাড়াটেদের একটি বছর পাঁচেকের ছেলে ঘরে ঢুকে পড়েই জিনিস টানাটানি শুরু করে দেয়। এটা-ওটা ফেলে। সুতরাং বেরোবার আগে ঘরের দরজায় অবশ্য চাবি। এটি তাঁর স্টাডি রুম, 'পরিবেশ'-এর অফিস। পাশের ঘরে তিনি ও মনোরমা দুটি আলাদা খাটে। আলাদা বিছানায়, তাও তো এক দশক হয়ে গেছে। নাকি দেড়, অথবা দুই! আজকাল সব অঙ্ক কেমন যেন গুলিয়ে যায়।

একতলায় পাঁচটি ঘরের ভেতর সুধাপ্রসন্ন অপরাজিতার দুটি, তাঁর ও মনোরমার দুটি। একটি দীপেশের। সুধাপ্রসন্নর বড় ছেলে প্রত্যুষপ্রসন্ন কানাডায় সেটল করেছে ষোলো বছর। গ্রীন কার্ড পেয়ে গেছে। তার কানাডিয়ান বৌ। প্রত্যুষপ্রসন্নের দুটি ছেলে। ভারতবর্ষে এলে তাদের যদি প্রশ্ন করা যায়—হে, আর ইউ ইণ্ডিয়ান অর ক্যানাডিয়ান? তাহলে অক্লেশে জবাব পাওয়া যায়, উই আর ক্যানাডিয়ান। সঙ্গে ঘাড় ঝাঁকানো ভঙ্গিমাটি পর্যন্ত ওদেশের কপিবুক।

মাসে একটি চিঠি আসে প্রত্যুষপ্রসন্নর। এবং বাৎসরিক কিছু
সেই ...নার। সেই সব চিঠির কোনো একটিতে সুধাপ্রসন্ন জানতে পারেন
তদ্‌বির ...ষের বড় ছেলে ইগলু আইস-হকি খেলে কানাডায়, তার বেশ ...য়েছে জুনিয়র টিমে। খবরের কাগজে নাম বেরোয়। বিদেশী

টিকিটমারা, সেই লম্বা সুগন্ধী লেফাফায় প্রত্যুষপ্রসন্ন ইংরেজিতে লেখে—তার ও ক্যাথির প্র্যাকটিশ ভালোই চলেছে। ওদের ছোট ছেলে কাবুকি ভালো ভায়োলিন বাজাচ্ছে! হার্টের বাইপাস সার্জারিতে ক্যাথি ও প্রত্যুষের বহু টাকা, নাম।

কানাডা থেকে প্রত্যুষের ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা দেখতে পান না সুধাপ্রসন্ন। তিন বা চার বছর অন্তর মাস তিনেকের ভিসা নিয়ে ওরা ইণ্ডিয়ায় আসে। ক্যাথি এবং তার দুই ছেলের একেবারেই কলকাতার জল আর গরম সহ্য হয় না। এ শহর এত স্টাফি। কি রাশ! ডাস্ট, ডার্টি! বিলো পভার্টি লাইনের এত নিচে এইসব মানুষ কেমন করে থাকে এ শহরে, তা ক্যাথি আর ইগলু কাবুকির কাছে গোলকধাঁধা।

কলকাতায় এসে দু'চার দিন বসবাসের পর ওরা হয় পুরী, নয়তো ভুটান বা নেপাল চলে যায়। পুরীর সমুদ্রের ধার থেকে সংগ্রহ করে আনা স্বর্ণবর্ণ বালি ও লবণাক্ত জল প্লাস্টিকের প্যাকেটে নিয়ে কানাডা ফিরে যায় ইগলু আর কাবুকি। ইণ্ডিয়ান স্যানডের মতো গোল্ডেন কালার তারা আগে কখনও দেখে নি। এ বিস্ময়টুকুই শুধু। আর সংগ্রহের গর্বটুকুও তাদের সহপাঠী-সহপাঠিনীদের কাছে। কোনো এক শরতে, নাকি হেমন্তে—হিসেবে সব গোলমাল হয়ে যায় সুধাপ্রসন্নর—বারোয়ারি প্যাণ্ডেলে কালীমূর্তি দেখে সুধাপ্রসন্নর হাত ধরা বছর সাতেকের ইগলু প্রশ্ন করে—হু ইজ দ্যাট হুলা হুলা ডান্সার?

সকলের মাঝখানে নাতির এই প্রশ্নকে চাপা দিতে গিয়ে সুধাপ্রসন্নকে ছল করতে হয়। সেই ছলনার আবরণটুকু তাঁকে অন্তত মানায় না।

ওরা আর এদেশে ফিরবে না—এমনটিই ধরে নিয়েছেন সুধাপ্রসন্ন। প্রবাসী পুত্র, পুত্রবধূ, এমনকি নাতিরাও প্রায়ই তাঁকে লেখে এখানকার বাড়িঘর বিক্রি করে কানাডায় চলে আসতে।

সুধাপ্রসন্ন অঙ্ক কষেন। তাঁর মেজো ছেলেটি দুবাইয়ে সিভিল ইনজিনিয়ার। পাঁচ বছর অন্তর অন্তর কনট্রাকট রিনিউ হয়। প্রচুর টাকা আর জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি ফেরে প্রদোষপ্রসন্ন। বৌমা বীথি

আর ওদের একটি মাত্র কন্যা শঙ্খমালাকে নিয়ে প্রদোষ শুধু টাকার স্বপ্নে। অনেক টাকা রোজগার করে দেশে ফিরবে সে। শুধু দুবাই নয়, লিবিয়াতেও প্ল্যানট ইনস্টল করতে চলে যাওয়া প্রদোষের। অমানুষিক পরিশ্রম, অজস্র টাকা। বিদেশী গাড়ি। আধুনিক গ্যাজেটস।

সুধাপ্রসন্ন লক্ষ করেন তাঁর দুই ছেলের কোনো একজন এদেশে এলেই সকলে প্রতীক্ষায় থাকে নানাবিধ ফরেন গুডসের। ভোগ্যপণ্যের জন্যে ক্রমাগত এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর বুকের বাতাস কমিয়ে দেয়।

প্রত্যুষ আর প্রদোষ দু'জনেরই ঘর-বাড়ির দুটো বড় রঙিন ছবি আছে সুধাপ্রসন্নর অ্যালবামে। আলাদা করে ঘরের ভেতরের ছবি। ইগলু, কাবুকি আর শঙ্খমালার জন্মদিনের ফোটোগ্রাফ। এসব কালারড চিত্রমালায় আলাদা করে কানাডা বা দুবাইকে চেনার উপায় নেই। সুধাপ্রসন্ন জানেন কানাডায় এক টুকরো সবুজের ভেতর প্রত্যুষ-প্রসন্নের বাড়ি। সামনের লনে অনেক বাহারী ফুল। পাখিরা ডেকে যায়। প্রজাপতি ওড়ে। ঘাসফড়িং, আরও কি কি কীটপতঙ্গ।

সেখানে ক্যাথি আর প্রত্যুষের দুটো আলাদা গাড়ি। ওরা উইক এণ্ডে পিকনিকে যায় সপরিবারে। আর প্রদোষের আধুনিক ফ্ল্যাটে সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধে, আরামের আয়োজন।

সুধাপ্রসন্নর মেয়ে নীলিমা এখন বোম্বেতে। তার স্বামী শেখর ইণ্ডিয়ান নেভির কমিশনড অফিসার। শেখর ও নীলিমার এগারো বছরের দাম্পত্যে একটিই মাত্র স্মারকচিহ্ন—তিথি। তিথি বোম্বের স্কুলে পড়ে।

অনেকক্ষণ বন্ধ থাকার পর ঘর খুলে ফেললে একটা ভ্যাপসা গন্ধ টের পাওয়া যায়। বিশেষ করে এই বর্ষায়, বাতাসের হিউমিডিটি, স্তূপ করে রাখা ঘামে ভেজা জামা-কাপড়, সব মিলিয়ে যেন বা অক্সিজেনের ভাঁড়ারে টান পড়ে।

প্রথমেই সুইচে হাত দিয়ে টিউব জ্বালাতে চাইলেন সতীপ্রসন্ন। মিনিট খানেকের চেষ্টাতেও জ্বলল না। বোধহয় ভোল্টেজ ড্রপ করেছে। তারপরই পাখা আর একশো পাওয়ারের বালব পর পর

চালানো ও জ্বালিয়ে দেয়া

এ ঘরের পুবের জানলাটি খুলতে গিয়ে আজও সতীপ্রসন্ন টের পেলেন বুঝি বা গাছের ডাল আর পাতা জানলার রড পেরিয়ে ঢুকে আসতে চাইছে তাঁর ঘরের ভেতর। জানলার প্রায় গা লেগে ওঠা পেঁপে গাছের ডাল-পাতা প্রায়ই ভেঙে দিতে চান মনোরমা। সতী-প্রসন্ন না করেন। থাক না। সবুজে তো মায়া থাকে।

এখন, কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টিতে স্নান সেরে নেয়া পাতা-ডালেরা জানলার ধাক্কায় জলের ছিটে দিল তাঁর মুখের কোথাও। এ গোপন স্পর্শে যেন বা বিমোহিতই সতীপ্রসন্ন। কাঠের খড়খড়ি দেয়া জানলা হাতের চাপে খুলে, ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে তিনি পেঁপে গাছের ভিজে ডাল ছুঁয়ে ফেললেন। তাতে আর এক দফা রোমাঞ্চ। ততক্ষণে লোহার শিকের ভেতর দিয়ে তাঁর ঘরের ভেতরই উঁকি দিতে শুরু করেছে পেঁপে গাছের পাতা সমেত একটি ডাল। আর তার গা বেয়ে লতিয়ে ওঠা কোনো লতার আকষি।

নির্দিষ্ট ফাইলে 'পরিবেশ'-এর জন্যে ডাকে পাঠানো লেখা দুটি গুছিয়ে রাখতে রাখতে সতীপ্রসন্ন টাইমপিসে দেখতে পেলেন রাত নটা। ঘামে ভেজা পাঞ্জাবি হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে তাঁর মনে এলো আজকের বিকেলের সেমিনার। পরিবেশ এবং দূষণ নিয়ে দুশ্চিন্তা এখন পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই। মানুষ তারই সভ্যতার ধোঁয়ায়, তেলকালিতে, সমুদ্র, আকাশ, নদী—সবেতেই ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষ। মাইলের পর মাইল অরণ্য ধ্বংস করে ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স নষ্ট করেছে। গোটা ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়েছে গ্রীন হাউজ ভীতি —যা কিনা দুই মর্ডান কিলার, এইডস আর ক্যানসার থেকেও বেশি আতঙ্ক ছড়িয়েছে মানুষের মনে। এমন কি স্টার ওয়ারস্ বা পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকেও দূষণকে বেশি বেশি করে ভয় পেতে শুরু করেছে সভ্যতা, খুব সঙ্গত কারণেই।

দোতলা থেকে এখনও সেকস-ভায়োলেন্সের বমির শব্দ কানে আসছে। আর তখনই তার বাড়ির সামনের রাস্তা—মজলিশ আরা

রোডের বাতাস ছিঁড়ে দিতে দিতে তীব্র হর্ন বাজানো একটি ট্যাক্সি গড়িয়ে গেল।

মনোরমার ডাল সম্বারের ঘ্রাণ ছড়িয়ে গেছে এ বাড়ির খোপে খোপে।

দুই

খুব ভোরে উঠে বাতাস থেকে কিছু তাজা অক্সিজেন ফুসফুসে ভরে নিতে রোজই বেরিয়ে পড়েন সতীপ্রসন্ন। পৃথিবীর গায়ে তখনও অন্ধকার। এমনকি কোনো কোনো দিন তারার আলোও। টিনের বেঁটে গেট ঠেলে বাইরে এসে রাস্তায় নামেন। আর আগে বাইরে থেকে বাড়ির কাঠের দরজায় তালা। বারান্দার আর একদিকে খিলবন্ধ দরজাটি খুলে একটু ঘুরপথে বাথরুম-পায়খানায় যাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই। আর এদিকের দরজাটা চাবিটি তাঁর পকেটে থাকায় অনধিকারীর, অবাঞ্ছিতের অনুপ্রবেশ প্রায় অনিশ্চিতই থেকে যায়। যাওয়ার আগে রেক্সিন মোড়া খাওয়ার টেবিলের নির্দিষ্ট জায়গায় রাতে রাখা দুধের কার্ড, গোনা পয়সা পকেটে।

বাঁ-দিকে হাঁটা ধরলে প্রথমেই সবুজে সবুজ বাঁশ গাছ, তার পেছনে কবরখানা। একটি অর্ধেক তৈরি হয়ে থেমে থাকা ইট-সিমেণ্টের মসজিদ। বাঁশ গাছের পেছনে আটকিরে, আকন্দ, ঘেঁটু, বন-কচুর জঙ্গল। সেখানে এই বর্ষায় রঙিন প্রজাপতি। ঘাসফড়িং। সোজা হাঁটতে থাকলে ঐ ডানদিকেই অনেকখানি নিচু জমির ঢাল।

কবরখানার সীমানা যে ভাঙা পাঁচিল, তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে বাঁশের সবুজ পাতারা। জমির ঢাল থেমে গেছে জলে। গ্রীষ্মে যে মাঠটি পাড়ার নব বয়েসীদের ফুটবল নিয়ে দাবড়ানোর জায়গা, সেখানে আপাতত পদ্ম পুকুরের আগ্রাসন। লম্বা, টানা পুকুর জলে তেমন গভীরতা নেই। অথচ বিস্তার আছে। তাল গাছের

কাচা কাণ্ডে অস্থায়ী ঘাটলা। কখনও নারকেল কাঠেও। আরও ফরসা হয়ে গেলে এই পুকুরের ধারে পাতিহাঁসেদের গোল টেবিল। আড্ডা। খুঁটিতে বাঁধা গোরু। চারপাশে ছড়ানো স্নিগ্ধ সবুজ।

ফুটি ফুটি আলো একটু একটু করে পৃথিবীর রং পাল্টে দিলে কচু-গাছের পাতায় গত রাতের, অথবা ভোরের বৃষ্টির জল মহার্ঘ মণি-মাণিক্য হয়ে পড়ে থাকে। তার পাশেই থুপ থুপ করে লাফিয়ে চলা ব্যাং শিকারের দিকে স্থির লক্ষ্য তার। কিছুই সতীপ্রসন্নর দৃষ্টির ফ্রেমের বাইরে চলে যায় না। এমন কি কোনো উড়ে যাওয়া গাঙ শালিক, অথবা কাক কি চড়াই।

তবু পাখি কমে আসছে, পোকা কমছে, ব্যাং কমছে। কীটনাশকে, ধোঁয়ায়, অ্যাসিড-বৃষ্টিতে, বহুতল বাড়ি আর শব্দ দূষণে ফিরে যাচ্ছে প্রকৃতি। ইদানীং আর ব্যাং শিকারী চোখে পড়ে না। বছর দশ-বারো আগে হঠাৎ হঠাৎ রাতের অন্ধকারে চট বা পলিথিনের বড় বস্তা, কোঁচ, চিমটে আর লণ্ঠন-টর্চ হাতে ব্যাং-শিকারীরা মাঠেঘাটে বনে-বাদাড়ে। রাতের পাড়া পাহারা দেয়া নেড়িরা তাদের দেখলেই তাড়া দিত। নাইট গার্ড দেয়া ছেলেরাও। আরও ভেতরে—দূরের গ্রাম থেকে আসা মানুষ, হাঁটু অব্দি ফুলপ্যান্ট গোটানো। গায়ে মোটা কাপড়ের জামা। রাত জাগা লালচে চোখ, এলোমেলো চুল।

পয়সার জন্যে এভাবেই রাতের পর রাত পার করে দেয়া। বিদেশে ব্যাঙের ঠ্যাং যাচ্ছে। খুব দামী খাবার। ভালো চিকেনের থেকেও নাকি স্বাদু।

পদ্ম পুকুরের জলে এখন কোনো তরঙ্গ নেই। তার মাথার ওপর ঝুলে থাকা ভোরের আকাশ ছায়া হয়ে ভেসে আছে ঐ জলেই। ধোপাদের বাঁশ আর টালির আস্তানায় এখনও জেগে ওঠার ছন্দ ফুটে ওঠে নি।

ছাউনির পাশে মাটির বড় বড় গামলা, তাতে ঘন নীল জল, নয়তো সাবান-সোডার ধূসরতা। দাঁড় করানো দুটি ঠ্যালা গাড়ি। তারপরই আড়াআড়ি বাশ দাঁড় করিয়ে, দড়ি খাটিয়ে রোদে-হাওয়ায়

কাপড় শুকনোর ব্যবস্থা। নতুন তৈরি হওয়া কয়েকটি বাড়ি। অনেকেরই বাইরের দেয়াল প্লাস্টার হয়নি। উল্টোদিকে অমিতাভ হেয়ার কাটিং সেলুন, এখনও দরজা বন্ধ। তেলেভাজার দোকান। তারও পরে পাঁচিলের আড়ালে জাম গাছে থোকা থোকা কালো জাম। তারা কেউ কেউ মাটিতে পড়ে পায়ের চাপে থেঁতলে গিয়ে নিজস্ব গাত্র বর্ণে রাস্তায় রং দিতে পেরেছে।

সুকান্ত পল্লী বাস স্টপের বাঁধানো বটতলায় এসে ডানদিকে মুড়লেন সতীপ্রসন্ন। একটু জোরে হাঁটবেন। খর পায়ে। ফুসফুসে তাজা অক্সিজেন ঢুকবে। কপালে বুকে পিঠে বগলের তলায় ঘাম জমবে। জামা ভিজবে। এক আশ্চর্য নোনা ঘ্রাণে ভরে যাবে শরীরের পারিপার্শ্বিক।

ভোরের হাঁটাটি সেরে বাড়ি ফিরে এসে সতীপ্রসন্ন দেখতে পান মাদার ডেয়ারির প্যাকেট বন্দী দুধ এসে গেছে। দরজার গোড়ায় ঠেস দেয়ানো দুধের পলিপ্যাক। তাঁর হাতে তখন হরিণঘাটার বরফ ঘামা বোতল। ভারি কাচের ওপর এমবস করা অশোক স্তম্ভের গায়ে হাওয়ার জলীয় বাষ্প স্বেদবিন্দু হয়ে লেগে থাকে। হাতের তালুতে কি এক শীতল স্পর্শ।

এখানে খবরের কাগজ আসে প্রায় আটটায়। বৃষ্টি-বাদলা থাকলে আরও দেরিতে।

ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন পেঁপে গাছের ভিজে ডালপালা ছোঁয়া রোদ তাঁর বিছানায় আরামে শুয়ে আছে। স্পণ্ডিলোসিস, স্লিপ ডিসকের জন্যে মনোরমা নিচু হতে পারেন না। টুলের ওপর বসে গ্যাসে রান্না করেন। বিছানা তুলতে তাঁর বেশ কষ্ট। অথচ ঝাড়া, পরিচ্ছন্ন শয্যা না হলে মনোরমা শুতে পারেন না। দীর্ঘদিনের অভ্যাস। এই অভ্যাসই তো মানুষকে দাস করে।

মশারির দড়ি খুলে বিছানা তুলে, গুছিয়ে রাখতে রাখতে সতী-প্রসন্নর আজও একবার মনে হলো তাঁর ও মনোরমার এই চল্লিশ বছরের দাম্পত্যে একটি ফুলও তো ফুটতে পারত। কখনও অসহায়,

হয়ে গেলে, সাংসারিক কাজকর্ম, শারীরিক প্রতিকূলতা, 'পরিবেশ'-এর কাজের চাপ বেশি থাকলে সতীপ্রসন্নর মনে হয়—মন্দ হতো না একটি ছেলে থাকলে। নয়তো একটি মেয়ে। তারও তো বিয়ে হয়ে যেত এতদিনে।

সন্তানের আকাঙ্ক্ষা আজও এই সামাজিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে প্রথমত পুরুষ সন্তানের জন্যেই। এমন কি সতীপ্রসন্নর মতো মানুষও। যিনি সক্রিয় রাজনীতি না করেও মানুষ এবং পরিবেশকে অনেকখানি সংস্কারমুক্ত করার ভূমিকায়। পরিবেশ-চিন্তায়, বিজ্ঞান ক্লাবে, বিজ্ঞান আন্দোলনে, মাদুলি-কবচ-তাবিজ-পাথর, জ্যোতিষের বিরুদ্ধে, প্রকৃতি সংরক্ষণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় এক সুনির্দিষ্ট চিন্তার বিন্দুতে দাঁড়িয়ে। এবং তারপরই নিজের সঙ্গে কথা বলে—থাকলেই বা কি হতো—দাদার তো দু'ছেলেই বাইরে, কেউ আসতেই চায় না, শুধু চিঠি লেখে আর ডলার পাঠায়—ভাবতে ভাবতে সতীপ্রসন্ন ঠিক করলেন আজ বালিশ দুটি রোদে দেবেন সারারাত শরীরের ঘাম শুষে নিতে নিতে বালিশেরা কখন যেন ভারি পাথর হয়ে ওঠে।

রান্নাঘরের টালির চালে রোদ পড়েছিল। তার হলুদ দেয়ালে সার বন্দী কালো সুড়সুড়ি পিঁপড়েরা ডিম মুখে নিয়ে উঠে আসছিল ওপরে। দেয়াল জুড়ে নিঃশব্দ ডিসিপ্লিন্‌ড লাইন। বাতাসে গরম বাড়ছিল। আজও কি বৃষ্টি নামবে? এখনই? দু পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে টালির চালে জোড়া বালিশ রোদ্দুরের আশায় নামিয়ে রাখতে রাখতে সতীপ্রসন্ন আরও একবার আকাশ দেখলেন।

দোতলার হরবনস মেহেতার ঘরে স্টিরিও ফোনিক সাউণ্ডে এক দো তিন চার পাঁচ ছে সাত আট নও দশ ইগারা—বারা তেরা…। কোরাসে, মিউজিকে হিট গানের যে আয়োজন, তা এই বাতাসের মেজাজ পাল্টে দিচ্ছিল। তাঁর কানে তীব্র স্বরে ঢুকে যাচ্ছিল—'তেরা করুঁ গিন গিন কে পার/আ যা সনম আয়ি বাহার…', তখনই বিষাদ-মনস্কতায় টালির চালের ওপর কুমড়োর ফলবতী লতানো সবুজের দিকে তাঁর নজর গেল। এই আবছা রোদেও তার পাতারা নেতিয়ে

পড়েছে। টালির শ্যাওলামাখা পোড়া ইট রঙের ঠিক ওপারেই ভাগবতদের জমিতে কলাগাছের সবুজ পতাকা।

মজলিশ আরা রোডের ঠিকানায় এ পরিবারের সমর্থ, কম বয়েসী মানুষ বলতে দীপেশ। তিনদিন বাড়ি নেই। লক্ষ্ণৌ গেছে কোনো মিউজিক কনফারেন্সে। সরোদিয়া দীপেশ ঘোষ। সুধাপ্রসন্ন এবং সতীপ্রসন্নর মাঝে যে একটি ভাই, সেই শ্যামাপ্রসন্নর একমাত্র সন্তান। বছর পঁচিশ আগে পশ্চিমবাংলার ঘটে যাওয়া শেষ ভয়াবহ দাঙ্গায় শ্যামাপ্রসন্ন নিরুদ্দেশ। একটু খামখেয়ালী, একলা থাকতে ভালোবাসা, বারে বারে চাকরি বদল করা শ্যামাপ্রসন্নর হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে ঐ দাঙ্গার হয়ত কাকতালীয় সম্পর্ক আছে। কিংবা আদৌ কোনো যোগ নেই। তবু যেহেতু সেটি দাঙ্গার বছর, তাই স্মৃতিতে শ্যামাপ্রসন্নের সঙ্গে দাঙ্গাকেও মনে পড়ে।

দীপেশের মা অরুণিমা বারো বছর সধবা সেজে, হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী দিনপাত করতে করতে ক্লান্ত ক্ষিপ্ত, মানসিক টেনশানে ধ্বস্ত হতে হতে কি সব আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে হু হু কান্নায় বিধবার সজ্জা পরে নেয়। অরুণিমা আর চার বছর মাত্র বেঁচে ছিল বিষাদ-প্রতিমা হয়ে।

আজও শ্যামাপ্রসন্নর কোনো খবর আসেনি। জীবনে এরকম বহু সংবাদই না আসা থেকে যায়। হয়ত প্রতীক্ষা থাকে এক অনাগত ডাকপিওনের। যে চিঠি আনবে।

বিছানার ওপর বেড সিট না বিছিয়ে দিলে মনোরমা রাগ করে। হাওয়ার পড়তি ধুলো ঘরের জানলা এড়িয়ে জড়িয়ে যায় বিছানার চাদরে, বালিশে। শয্যার ওপর বাবু হয়ে বসলে বুক সমান পাঁচিলে সবুজ শ্যাওলার ফুলকারি চোখে পড়ে। বৃষ্টিতে তার রঙে প্রাথিত উজ্জ্বলতা। আর ঐ পাঁচিলের গা থেকে তাঁর ঘরের জানলায় রোদে-জলে কিছু বিবর্ণ খড়খড়ির গায়ে হাওয়ায় ভেসে যাওয়া মাকড়সাকে জাল বুনতে দেখতে পান সতীপ্রসন্ন। যেন বা সার্কাসের কোনো দক্ষ ট্রাপিজ খেলোয়াড়। পেট থেকে বেরিয়ে আসা লালার সুতোয়

সুতোয় একবার খড়খড়ি থেকে পাঁচিলে, আবার পাঁচিল থেকে খড়খড়িতে। কবে যেন কোন পড়ার বইতে একটা লাইন পড়া ছিল সতীপ্রসন্নর—'ঊর্ণনাভে জাল বুনে যায়।' সেকি তাঁর কোনো পাঠ্য বইয়ে? নাকি প্রত্যূষ, প্রদোষ, শঙ্খমালা অথবা দীপেশের বইয়ের পাতায়?

ইদানীং স্মৃতি বড় প্রতারণা করে। ভারাতুর হয়ে থাকা স্মৃতিরা সময়কে উল্টে পাল্টে দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায় বাইরে। কোনটা আগে হয়েছে, কোনটাই বা পরে—তেমনভাবে সবসময় তাল রাখা যায় না।

মনোরমা দু'খানা গরম রুটি আর বেগুনভাজা এনেছিলেন। সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ কুচি। একটি সতেজ, সবুজ লঙ্কা। এ লঙ্কা তাঁর উঠোনের, নিজের হাতে। তেল বড় বেশি দেন মনোরমা ভাজায়। থালায় লেগে থাকা অতিরিক্ত তেল থেকে ভাজা বেগুন সরিয়ে এনে রুটি দিয়ে খেতে খেতে সতীপ্রসন্নর মনে হলো জিভে যতদিন তার থেকে যায়, ততদিনই রসে রূপে বর্ণে গন্ধে এ জীবন—এই একটাই জীবন, বর্ণালীতে সেজে থাকে।

এ ঘর থেকে যে আমগাছের মাথা, নারকেল গাছের চুড়ো চোখে পড়ে, তার মাথায় ভাঙা ভাঙা মেঘ জমেছে। সেই রংয়ে ছাইয়ের আধিক্য।

রুটি বেগুনভাজা পেঁয়াজকুচি লঙ্কা—পর পর নিজের স্বাদ মতো মুখে তুলে, জিভ আর দাঁতে নাড়াচাড়া করতে করতে সতীপ্রসন্নর মনে পড়ল মনোরমা কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। তাঁদের প্রথম যৌবনে, যখন শয্যার নৈকট্য বড় কাঙ্ক্ষিত ছিল, তখন ঘনিষ্ঠ চুম্বনে বাধা ছিল পেঁয়াজ-গন্ধ। উঁ-উঁ বলে ঠোঁট সরিয়ে নিতেন মনোরমা।

ইদানীং আলাদা শয্যায়, বড় জোর রাতে বাথরুমে যাওয়ার আগে খিল খোলার সময় অবলম্বনের জন্যে, অথবা নিরাপত্তা খোঁজার তাগিদে আওয়াজ দিয়ে—'আমি বাইরে যাচ্ছি' বলে যাওয়া। শরীরের কোনো

টান নেই। তবে কোথায় যেন আরও জড়িয়েছেন দু'জনে: প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ওষুধ চেয়ে, সময়ে ওষুধে দিয়ে—পরস্পরের জীবনে আরও টান-ভালোবাসা। নাকি প্রয়োজনের জোড়াতাল? একসঙ্গে থাকার অভ্যাসে যা নিত্য ছবি।

খেয়ে ডিশ ধুয়ে রাখার অভ্যাস বরাবর। বাইরের ইট বাঁধানো উঠোনে এসে টিউবওয়েল টিপে টিপে ডিশ ধুলেন। হাতের আঁজলা করে করে জল খেলেন এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে। মনোরমা দেখলে বকবে।

টিউবওয়েলের ডানদিকে টিনের বেঁটে দরজা ঘেরা চানের জায়গা। বাঁ-দিকে ফাঁকা জমিতে শাদা এবং মেরুন ফুলে হেসে ওঠা সন্ধ্যামণির ঝোপ। বাসকের জঙ্গল, কালমেঘের গাছ। এ বাড়িতে ইটের পাঁচিল দেয়ার আগে বাসক গাছের বেড়া ছিল। কালমেঘের ঝোপের পাশে কালো ভেলভেট রং প্রজাপতি এ পাতার সবুজ টপকে অন্য লতার সবুজে উড়ে গিয়ে কোন দিগন্তে যেন মুছে যায়।

হাত ধুয়ে, ডিশ নিয়ে বারান্দায় উপুড় করে দিয়ে, নিজের ঘরে 'পরিবেশ'-এর এই সংখ্যার কপি প্রেসে দেয়ার জন্যে ফাইল নিয়ে বসলেন। আজ কলেজ স্ট্রিটের অফিস ঘরে একটু দেরিতে যাবেন। অরিন এলে চাবি দিয়ে ওকে পাঠিয়ে, বাড়িতে কিছুক্ষণ বেশি কাজ করবেন।

পাবলিকেশন লাইনেও কম করে বছর পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেল। কি বাজার ছিল বাংলা বইয়ের! আসাম, ভাগলপুর, পাটনা, মুঙ্গের। গত বছর দুই অসম্ভব দাম বেড়েছে কাগজের, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছাপার খরচ। বাঁধাই। আড়াই টাকার কমে কিছুতেই এক ফর্মার হিসেব আসে না। মার্কেটিং শব্দটি ইদানীং বুক ট্রেডেও। আর ট্রেড শব্দটি নিয়েই তো যত আইনগত ঝামেলা। সরকার তো আজও বুক ট্রেডকে বুক ইণ্ডাস্ট্রি বলল না। ফলে ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিতে গেলে বেশি ইন্টারেস্ট দিতে হয়। নির্দিষ্ট একটি পাক্ষিক আর দৈনিকে বিজ্ঞাপন না দিয়ে নতুন বইয়ের কথা কেউ জানে না। তার রেট

ক্রমশ বাড়ছে, লাফিয়ে লাফিয়ে।

গত দশ বছর গোটা তিনেক রিপ্রিন্ট আর নিজের কাগজের অফ প্রিন্ট থেকে বই বের করা ছাড়া কিছু করতে পারেন নি সতীপ্রসন্ন। তাঁর কাচের শো-কেস এখন অনেকটাই ফাঁকা। অথচ দোকান খুলতে হয়। বিজ্ঞাপনের সাইজের জন্যে 'পরিবেশ'-এর চেহারা ওয়ান এইট ডিমাই সাইজ থেকে স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজে নিয়ে এসেছেন। ওর অফ প্রিন্ট থেকে এখন আর স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজের বই হয় না। এখন 'পরিবেশ'-এর তিনজন কর্মচারী। প্রেসে আসা-যাওয়া, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করার জন্যে একজন, একজন প্রুফ রিডার। আর একজন সাবএডিটর কাম রিপোর্টার কাম 'পরিবেশ'-এর সেলস কাউণ্টার সামলানোর দায়িত্বে—অরিন।

কারোরই মাইনে পাঁচশো টাকার কম নয়। কলেজ স্ট্রিটে এমনিতেই বুক ট্রেডে মাইনে কম। দেড়শো-দুশো-আড়াইশো—অনেকটা যেন বা মধ্যযুগীয় প্যাটার্ন। তিরিশ হাজার সার্কুলেশনের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান চেতনার কাগজ 'পরিবেশ' তার তিনজন কর্মচারী এবং একজন কমিশন বেসড বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি রাখতে পেরেছে একটিই কারণে—নিজের স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং এতটুকু বাড়ান নি সতীপ্রসন্ন। সেই ধুতি এবং খদ্দরের মোটা শার্ট, ক্বচিত আদ্দির পাঞ্জাবি—তাও অধিকাংশই গিফটেড।

সামনের সংখ্যায় কি কভার স্টোরি যাবে ভাবছিলেন সতীপ্রসন্ন। ইদানীং এই এক হুজুগ—প্যাকেজ দাও। একটি বিষয়ের ওপর অনেক লেখা। সঙ্গে কালারফুল ছবি, ইলাসট্রেশন, চার্ট, ম্যাপ, টেবল, ডাটা, স্ট্যাটিসটিকস। তার জন্যে আলাদা পরিশ্রম আছে। বহু দেশী এবং বিদেশী ম্যাগাজিন ইংরেজি ডেইলি খুঁটিয়ে দেখতে হয়। তারপর তা থেকে ক্লিপিং রাখা—বিষয় ধরে ধরে। নিজেকে খাটতে হয়। অরিন পরিশ্রম করে। এ কাগজে সহযোগী সম্পাদক হিসেবে নামটিও ছাপা হয় অরিনের।

কখন যেন রোদ মুছে গিয়ে বর্ষার প্রাকৃতিক অভ্যাসে বৃষ্টি এসে

গেছে। ঘরে বসে, কপিতে, কভার স্টোরির ভাবনায় মশগুল হয়ে সতীপ্রসন্ন বর্ষণ টের পান নি।

মনোরমা যখন প্রায় দৌড়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে বালিশ ভিজে যাবে, তুলে আনো বলতে বলতে বার কয়েক নিজে চেষ্টা করে তাঁর খর্বতার জন্যে ব্যর্থ হন এবং সতীপ্রসন্নর স্টাডিতে ঢুকে বিষ্টিতে বালিশ ভিজে গেল, বলে আরও এক দফা চেঁচিয়ে ওঠেন, তখন সতীপ্রসন্ন হঠাৎ নিজেতে ফিরে ছুটে উঠোনে নামেন। ততক্ষণে পাশের রান্নাঘর থেকে অপরাজিতা, সম্পর্কে সতীপ্রসন্নর বৌদি এবং বড় শালি বালিশ তুলে বৃষ্টি এবং মেঘলা পারিপার্শ্বিকের ভেতর হেসে ফেলেন। তিনি সতীপ্রসন্নকে ভালো চেনেন।

এই মেঘলা, বৃষ্টির চালচিত্রে মনোরমা নিজের আপন মামাতো বোনটিকে ঠিকমতো চিনতে পারেন না। আর নারীর স্বাভাবিক ঈর্ষায় ভেতরে ভেতরে ঢং কথাটি চিবিয়ে ফেলেন।

সতীপ্রসন্নর বছর দুইয়ের ছোট অপরাজিতা যেন বা চকিত হেসে, চোখে বিদ্যুৎ টেনে এনে বলেন, ঘরে যাও। ভিজে যাবে। এ স্বরক্ষেপণে কিছু রহস্য। হাসিতে মায়া। আর যৌবনে, আবেগে, যখন অন্তরঙ্গ মুহূর্তে মনোরমাকে কখনও কখনও ফ্রিজিড মনে হয়েছে সতীপ্রসন্নর, তখন অপরাজিতা হাসিতে শরীরে বয়েসে রহস্যে মাধুরী হয়েছেন। মনের মাধুরী।

বিদ্যুতে আকাশ ডেকে উঠল। বৃষ্টি তার ফোঁটায় ফোঁটায় পৃথিবীর বুকে নেমে আসার জন্যে খরতর। অপরাজিতার মাথা থেকে উড়ে আসা জবাকুসুমের গন্ধ বহুদিন পর এই দ্বিতীয় ঋতুর এগারোটা বেলায় বিভোর করে দিয়ে গেল সতীপ্রসন্নকে। আজ শরীর নেই, উত্তাপে শুধুই ছাই, তবু রহস্যময়তা থেকে গেছে।

এটুকু সরস হয়ে ওঠার নামই জীবন। সতীপ্রসন্ন হাসলেন। টালির চালের নিচে পাঁচ ইঞ্চি পাঁচিলের আড়ালে দুই জা, দুই মামাতো পিসতুতো বোন, দুই নারী ফিরে গেল। বালিশ ধরে, ঠিক ধরে নয়, বুকের কাছে আগলে সতীপ্রসন্নর ঘরে ফিরে আসা।

তিন

সরোদে তিলক কামোদ বাজাতে বাজাতে দীপেশ মগ্ন ছিল। ঘরে একটি মাত্র আলো। তার ঘরে নানান ধরনের লাইটের ব্যবস্থা। এখন রাত কত, দীপেশ জানে না, তার হাতে কোনো ঘড়ি নেই। শুধু তার এক জার্মান ছাত্রীর দেয়া পুতুল নাচা ঘড়িটি, যার চলন ব্যাটারিতে —জানান দিচ্ছিল এখনই আটটা বাজবে। ঘড়ির দুটি কাঁটা আটটা আর বারোটার ঘরে পৌঁছলেই আটটি ছোট ছোট পুতুল নাচতে নাচতে ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একপাক ঘুরে ঘড়ির পেটের ভেতর মিলিয়ে যাবে। একটায় একটি ঘণ্টা, একটি পুতুল। দুটোয় দুটো ঘণ্টাধ্বনি, দুটো পুতুল। এমনি করে বারোটা পুতুল পর্যন্ত।

ঘরে চন্দনের গন্ধ। দীপেশ চন্দনঘ্রাণ ভালোবাসে। গুরুজিরও পছন্দ চন্দন-সুবাস। লক্ষ্ণৌ কনফারেন্স খুব জমেছিল। গুরুজির সোলো একদিন! একদিন দীপেশের। অন্যদিন ভোকাল। সরোদে, কোলে রাখা বাজনার ওপর ঘাড় নিচু করে সুরে ডুবে যেতে যেতে অনেকটা যেন গুরুজির ভঙ্গিতে ঘাড় ঝাঁকিয়ে তবলচিকে—যে এখন তার পাশে নেই—থামিয়ে চাপান দিতে দিতে দীপেশ আবারও ঘাড়ে ঝাঁকানি দিল। তার মুড়ে বসা পা একটু একটু করে নড়ছিল। এটুকু ফাংশনেও নড়ে।

দেয়ালে বড় ছবিতে গুরুজি হাসছেন। তাঁর দাড়ি-গোঁফ কামানো উজ্জ্বল মুখ, কাঁচা-পাকা কোঁকড়ানো মাথার চুল হাসছে। আর একটি ছবিতে প্রধানমন্ত্রী গুরুজি আর দীপেশ। ছবিটি দিল্লিতে তোলা। চন্দন গন্ধ একটু একটু করে পুড়তে পুড়তে হাওয়াকে বিকশিত করছিল। তিলোক কামোদে যতটা ডুবে থাকা যায়, ততটাই ডুবে ছত্রিশের দীপেশ আবারও সরোদে ঝুঁকল। এবার সরোদে একটা ধুন বাজাবে। তার এই সুরান্তরে যাওয়ার সময়টুকুতে আটটি পুতুল নাচতে নাচতে

সময় বাজাতে বাজাতে নিজস্ব জগতে ফিরে গেল। শব্দ টের পেল না দীপেশ।

লক্ষ্ণৌয়ে তিন দিন গুরুজির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দীপেশ ভেবেই নিয়েছিল চট করে আর কলকাতা ফিরবে না। গুরুজির সমস্ত পৃথিবী থেকে আসা ছাত্রদের মধ্যে তার একটু অন্যরকম জায়গা, কনফারেন্সে ঢোকার আগে সবার সামনে তার দু'গালে দুটি দীর্ঘ চুম্বন—গুরুদেবের গা থেকে চন্দনগন্ধ আসছিল। অন্য সকলের ঈর্ষায়, কিছু জিজ্ঞাসায় এবং হয়ত চাপা কুৎসাতেও দীপেশ সেই চুম্বনে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে মাথা নিচু করেছিল।

কনফারেন্সের উদ্যোক্তারা, ইউ. পি. সরকারের মন্ত্রী-আমলারা এবং বহু সালাঙ্কারা রমণী দীপেশের দিকে কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আর দীপেশ তার সমস্ত রেওয়াজি অভিজ্ঞতা উজাড় করে গুরুজির পাশে থেকে এবং পরদিন নিজের একক অনুষ্ঠানে প্রমাণ করে দিয়েছিল কেন গুরুজি ইণ্ডিয়াতে এসে বাজাবার আগে প্রোগ্রাম করার পূর্বাহ্নে দীপেশ দীপেশ করেন।

এবারের কনফারেন্সে গুরুজির উপহার দেয়া হিরের আংটি এখন এই ফিকে অন্ধকারে ঘরের ভেতর নিজস্ব দ্যুতিতে। ডান হাতের অনামিকায় সেই ভালোবাসার স্মৃতি, হয়ত কিছু অহংকারও। ঘরে চন্দনের সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

গুরুজি দিল্লিতে দুদিন স্টে করে প্যারিস চলে যাবেন। সেখানে ফরাসি বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকীতে তাঁর আরও কিছু অনুষ্ঠান। দীপেশের ইচ্ছে করছিল গুরুজির নৈনির বাংলো, ফার্ম হাউস, মিউজিক রিসার্চ সেণ্টারে কয়েকদিন কাটিয়ে আসে। আপাতত কলকাতার জন্যে তার কোনো টান ছিল না। তবু এলাহাবাদ থেকে কিছু দূরে নৈনি যাওয়া হয় নি।

দীপেশ এখন কলকাতাতেই। এই অস্থিরতা, এক জায়গায় থিতু হয়ে না বসা—এমন সংক্রমণের মূল কারণ বোধহয় শ্যামাপ্রসন্ন তিনিও তো কোথাও থিতু হন নি। এমনকি তাঁর অনির্দেশ-যাত্রা

আজও রহস্যে। বাবার এই ধারাটুকু অন্তত সে পেয়ে গেছে।

রাত আটটা বাজার পর এবাড়ির মানচিত্র এখন এরকম। সুধাপ্রসন্ন একলা বসে আছেন টেলিভিশন সেটের সামনে। আজ তাঁর খবরের কাগজে লেটারস টু দি এডিটর লেখার তাড়া নেই। এই মাত্র টি ভি-র পর্দায় 'অগ্নি' আকাশে উঠে গেল, তারপরই প্রধানমন্ত্রীর একটু বেশি চুলঅলা মুখ, মাথা। তখনও এভাবে তাঁর টাক পড়ে নি। বেশ কয়েক বছর আগে তোলা প্রধানমন্ত্রীর অপেক্ষাকৃত কচি মুখের নিচে তাঁর বাণী। পরবর্তী লাইন 'মেরা ভারত মহান'। সুধাপ্রসন্নর মুখ সামান্য কুঁচকে গেল বিরক্তিতে।

ধুনে আলাদা এক মেজাজ থাকে। গুরুজি যে সম্মান খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থে বিশ্বজোড়া, তার কোনো এক ভগ্নাংশও কি করে উঠতে পারবে দীপেশ? অন্তত শ্রবণা চলে যাওয়ার পর, পাকাপাকি ভাবে আইনগত বিবাহবিচ্ছেদে এক বছর পার হয়ে গেল এই তো সেদিন। তার আগে তাদের সাত বছরের দাম্পত্যে চারটে বছর তো আলাদা আলাদাই। শান্তিনিকেতনে শ্রবণার সঙ্গে প্রথম দেখার স্মৃতি, ধুনে বেদনা বেজে উঠল।

এ বাড়ির দোতলার চারটি ঘরের দুটি ঘরে পাঞ্জাবি ও হিন্দি ভাষার কিছু পারিবারিক সংলাপ, ভি সি আর-এর ছবি ও শব্দ যন্ত্রণা। পাশের ঘরে নতুন আসা ব্যাচিলর ছেলেটি এখনও অফিস ফেরত পার্ট টাইম সেরে ফেরেনি। তার ফিরতে রাত হয়। আর একটি ঘরে দীপেশের অধিকার। তার কোনো বন্ধু বা বান্ধব এলে, ব্যক্তিগত সংলাপের জন্যে এই চার দেয়াল আর ছাদ। এ বাড়িতে থাকলে রাতে শোয় দীপেশ, এ ঘরে।

টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়ে উঠে এলেন সুধাপ্রসন্ন। অবসরে ইংরেজি আর বাংলা ডিকশনারি খুঁজে খুঁজে শব্দ বের করা তাঁর এক শৌখিন অবসর বিনোদন। মনোরমা তাঁর সান্ধ্য হরিসভায়। অপরাজিতা এতক্ষণ টি ভি দেখছিলেন সুধাপ্রসন্নর পাশে বসে। বন্ধ করে উঠে যেতেই তিনি আবার চালালেন। টি ভি-র যান্ত্রিক গুঞ্জনটুকু

থেমে যেতেই এ বাড়ির বাতাসে প্রাচীন ফ্রিজের ঘর ঘর, ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ পল্লবিত হচ্ছিল। কিছুক্ষণ আওয়াজ, তারপর বিরতি। ঠাণ্ডা মেশিন তার শব্দে জানান দেয় সে চালু আছে।

ধীরে সরোদের তারে এ পর্যায়ের মতো শেষ ঝংকারটুকু তুলে থেমে গেল দীপেশের আঙুল। গোটা বাড়ি এতক্ষণ সুরে ছিল। তেমন কোনো শব্দ সেভাবে ধরা পড়ছিল না কানে। সরোদ থেমে যেতেই ভি.ডি.-ও চিৎকারে এবং দূরে কোথায় যেন মাইক-ধ্বনিতে শব্দ দূষণে ভরে গেল বাতাস। সুর থেকে শব্দান্তরে গিয়ে যেন বা প্রবল আঘাতে দীপেশ কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছিল। ভি. সি, আর-এর গান-বাজনায় কোনো বিরতি ছিল না।

নিজের ঘরে 'ডিসকভার', 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর কয়েকটি সংখ্যা, 'স্যাংচুয়ারি' আর 'জিও'-র কিছু পুরনো নাম্বার নিয়ে নাড়াঘাঁটা করতে করতে জোরে বেরিয়ে আসা বেদনার শ্বাস চাপলেন সতীপ্রসন্ন। এরকম একটা কাগজ, রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গোয়েজে স্বপ্নে ছিল। পারলেন না। এমন কি পুরোটা অফসেটে যাওয়াও হলো না। হ্যাণ্ড কম্পোজ থেকে লাইনোতে এসেছিলেন। তার কিছু পরে ভেতরের গোটা ছয়েক রঙিন পাতা অফসেটে। মলাটটা প্রথম প্রথম শারদীয় সংখ্যায় পাল্টানো হতো। তারপর রং পাল্টে পাল্টে বাকি দশটা সংখ্যা। শারদীয়র জন্যে একটা সংখ্যা কম। প্রতি সংখ্যায় 'পরিবেশ'-এর মলাট বদল, তাকে প্লাস্টিক ল্যামিনেটেড করা, কভার স্টোরি অনুযায়ী মলাট—এসবই গত দু'বছর ধরে।

বড় ফিনানসিয়াল সাপোর্ট, ডেইলির ব্যাকিং ছাড়া আজকাল কোনো কাগজকেই দাঁড় করানো মুশকিল। দশ বছর ধরে বিজ্ঞানের, পরিবেশ চিন্তার কাগজ করতে গিয়ে একটু একটু করে বদলেছেন সতীপ্রসন্ন। প্রথমে পরিবেশ বেরলেই 'দৈনিক ভোরের আলো'-তে বিজ্ঞাপন বাধা ছিল। ডবল কলম বিজ্ঞাপন। আর দৈনিকে একমাত্র ভোরের আলোতেই কাগজ বেরিয়েছে এমন ঘোষণাটি খদ্দের ডাকে। দৈনিক ভোরের আলো গ্রুপ অফ পাবলিকেশনস-এর এখন অন্তত

ছ'টি কাগজ। ইংরেজি দৈনিই 'মনিং সান', বাংলা সংবাদ পাক্ষিক 'সমকাল', খেলার পাক্ষিক 'ক্রীড়াযুদ্ধ' মহিলাদের ফ্যাশন চর্চার কাগজ সাপ্তাহিক 'সঙ্গিনী', বাংলা সাহিত্য মাসিক 'অনুভব'। সম্প্রতি বিজ্ঞান ভাবনা আর ফ্যানটাসি গল্পের কাগজ 'ভবিষ্যৎ' প্রকাশিত হয়েছে। শেয়ালদার কাছে, বিশাল মাল্টি-স্টোরিড অফিস। 'অনুভব' তার 'ভোরের আলো'—এই তো বাংলা প্রকাশনার বিজ্ঞাপন মাধ্যম। আর কেউ তো সেভাবে কোনো প্যারালাল কাগজ করতে পারল না। ফলে বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যাপারে মনোপলি, লেখক তৈরি, লেখা ছাপার ব্যাপারে মনোপলি। মানে দৈনিক ভোরের আলো তো এমনই বলে, যারা আমাদের এখানে লেখেন, তাঁরাই লেখক। বাকিরা নন, তাঁরা এলেবেলে।

রেট এত বেড়ে গেছে যে, গত বছর থেকে 'দৈনিক ভোরের আলো'তে বিজ্ঞাপন দেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন সতীপ্রসন্ন। কাগজ বেরলে এখন 'খবর'-এ বিজ্ঞাপন দেন। রেট অনেক কম। তবে টাইপ ফেস, প্রোডাকশানের বিভ্রমে যেন বা 'দৈনিক ভোরের আলো'। আর তাঁর নিজের পত্রিকার মাসিক তিরিশ-পঁয়তিরিশ হাজার গ্রাহক—এইটুকু তো সতীপ্রসন্নর প্রাইড। সব মানুষই কোনো আশা আর প্রাইড নিয়ে বাঁচে। তাই 'পরিবেশ', তাকে ঘিরে নানান ভাবনা সতীপ্রসন্নর জীবনে অক্সিজেন। আর 'ভবিষ্যৎ' বেরনোর সঙ্গে সতীপ্রসন্নর মনে হলো তাঁর সামনে এবার বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। যার বিজ্ঞাপন, মার্কেটিং, বিক্রির চ্যানেল—সবই তাঁর তুলনায় অনেক অনেক শক্তিশালী।

এখন টেলিভিশন সব থেকে শক্তিশালী মিডিয়া। যদি পারতেন সেখানে অন্তত কয়েক সেকেণ্ডের বিজ্ঞাপন দিতে, তাহলেও একটা জোরালো লড়াই গড়ে তোলা যেত হয়ত। কিন্তু সে টাকা কোথায়!

'দৈনিক ভোরের আলো'র প্রথম পাতায় গত একমাস ধরে রঙিন বিজ্ঞাপন 'ভবিষ্যৎ'-এর। কারা লিখছেন। কারা লিখবেন, সম্পূর্ণ সূচী। শুধু নিজের ব্যবসা, গোটা চারেক কর্মচারীর রোজগার,

নিশ্চয়তা—এসবই শুধু নয়, এ কাগজ নিয়ে গত দশ বছর তিনি তাঁর সমস্ত ভাবনা-চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ক্ষয়ে গেছে এর পেছনে। এটুকু চলে গেলে কি নিয়ে বাঁচবেন সতীপ্রসন্ন? বাংলা বইয়ের ক্রমশ কমে আসা বাজার, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়া বইয়ের দাম, টি ভি ও অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিডিয়ার ভয়ানক আগ্রাসন, সবার ওপরে বড় কাগজ, যারা ইণ্ডাস্ট্রি-সম, তাদের কাগজ করা—সতীপ্রসন্ন কোথায় যাবেন!

টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যাটি নিজস্ব মায়ায় পড়ে ছিল। আরও কয়েকটি সংখ্যা। একশো বছর ধরে একটা কাগজ, সোসাইটি তৈরি করে, নিজস্ব ফাণ্ড গড়ে কেমন বেঁচে আছে—এই লেভেলের প্রোডাকশান করে, ভাবতে বিস্ময় লাগে। কি ছাপা, কি ছবি!

'পরিবেশ'-এর কয়েক সংখ্যা আগে এই কাগজটিকে নিয়ে একটি কভার স্টোরি ছেপেছিলেন সতীপ্রসন্ন। মলাটে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যার মলাটের ছবি। অনেক টাকা ডাক খরচ দিয়ে কাগজটা পাঠিয়েছেন ওদের কাছে। এখনও জবাব আসে নি। শুনেছেন এ কাগজের একটি অ্যাসাইনমেণ্টে গেলেই এক বছর ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার খরচা উঠে আসে। আর আজও তিনি 'পরিবেশ'-এ পঞ্চাশ টাকার বেশি ভাউচার দিতে পারেন না লেখককে। শুধু কভার স্টোরি বা স্পেশাল আর্টিকেল হলে একশো, পুজো সংখ্যায় রেট কিছু বাড়ে। তবু কুলোয় না। প্রেসের টাকা বাকি থাকে, কাগজঅলা, ব্লক মেকার ক্রেডিট। এভাবে কি প্রাইড রাখা যায়! আজও তো 'পরিবেশ'-কে ঘিরে তেমন নিজস্ব লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠল না। এবং এই 'ভবিষ্যৎ' বেরনোর পর তাঁর লেখক আরও ভাঙবে। বেশি টাকা, অনেকটা ছড়ানো নাম—বিজ্ঞাপন, ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়ার আশা। মানুষ তো স্বাভাবিকভাবে এটাই চায়। অথচ তিনি তো চেয়েছিলেন একটা সুস্থ পরিবেশ-বিষয়ক আন্দোলন গড়ে উঠুক, সঙ্গে বিজ্ঞান চেতনা, আংটি-পাথর, কবজ-তাবিজ,

কুসংস্কার-গুরুজিদের ভেলকি—সব দিনের আলোর মতো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে একটা ঝড় তুলতে।

এই তো এবার আলিপুরের চিড়িয়াখানায় হিমালয়ের পা, আর সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসা হাঁসেরা নামে নি। তাদের কেউ কেউ সাঁতরাগাছির ঝিলে নামছে গত কয়েক বছর ধরে। নয়তো ভদ্রেশ্বরে, আরও দূরে ফারাক্কায়। পাঁচতলা হোটেল, শব্দ দূষণ, ঘুড়িতে বঁড়শি বাঁধা চোরা-শিকারী, ফিরিয়ে দিচ্ছে নাকতা, ছোট সরাল, বড় সরাল, নীল ডানা আর সুচীপুচ্ছ হাঁসেদের। এখন বড় জোর সাত-আট হাজার পরিযায়ী পাখি আসে চিড়িয়াখানার জলে। বছর দশেক আগেও আসত হাজার বারো মাইগ্রেটেড বার্ড। এখন যেমন ফেব্রুয়ারি মাসের শেষেও উড়ে আসে হাঁসেরা, তখন তাদের আসার সময় ছিল জানুয়ারির মধ্যেই।

বহুতল বাড়ি নামিয়ে দিচ্ছে জলের স্তর। বে-আইনী কনস্ট্রাকশান ভেঙে পড়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। শাল গাছ কেটে, অরণ্য ধ্বংস করে, মানুষ তার সুবিধের জন্যে লাগাচ্ছে ইউক্যালিপটাস, যা জলের স্তর নামিয়ে দিচ্ছে সমস্ত বনভূমির। ইউক্যালিপটাস-রোপণ মনে করতে গিয়ে সতীপ্রসন্নর মনে পড়ে গেল সুন্দরলাল বহুগুণা আর তাঁর চিপকো আন্দোলনের কথা। মানুষটি প্রায় একক যোদ্ধা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তবে তিনিই বা কতদিন পারবেন!

শীত এলে ধোঁয়া মেশা কুয়াশার ভারি পর্দা ঝুলে থাকে কলকাতার আকাশে। শ্বাস নিতে কষ্ট। হাজার হাজার উনোনের ধোঁয়ায়, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মাইকের চিৎকারে হাওয়া পচে। এই তো সেদিন ধর্মতলায় যাবার সময় হঠাৎ পার্ক স্ট্রিটে নেমে পড়েছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ফুটপাথে দেখলেন একজন বিদেশী নাকে-মুখে সূক্ষ্ম জালের ঠুলি লাগিয়ে হাঁটছেন। একি দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ? গোটা পৃথিবী কি একদিন এভাবে গ্যাস নিরোধক মুখোশ পরে হাঁটবে? যেমনটি দেখা যায় টি. ভি. বিজ্ঞাপনে। ছবি থেকে বাস্তব কি এভাবেই জ্বলন্ত চেহারা নিয়ে উঠে আসবে?

চারপাশে এখন কোনো শব্দ নেই। কলেজ স্ট্রিট থেকে একটু সকাল সকাল ফিরে সামনের দুটি সংখ্যার কভার স্টোরি ভাবছিলেন সতীপ্রসন্ন। পকেটের নোট বই খুলে লিখে রাখলেন—বহুতল বাড়ি এবং কলকাতার আকাশ।

রাতে খাওয়ার পর ড্রেসিং টেবিলের সামনে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে কায়দা করে রেখে চুল বাঁধছিলেন মনোরমা। তাঁর শিথিল গলার মাংসে, কুঁচকে যাওয়া হাতের চামড়ায় আলো নিজস্ব মাত্রায় পড়েছিল। প্রায়ই হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কুঁচকে যাওয়া চামড়া, চোখের কোলে ফুটে বেরনো মাংসের বালিশ, কপালের ওপর ক্ষয়ে আসা কেশভার, তার পলিত রং দেখেন মনোরমা। তাঁর বুক ভেঙে শ্বাস পড়ে। শরীরে সন্তান না আসায় আজও কখনও কখনও আব্দারে তিনি খুকিটি। গালের আলগা হয়ে যাওয়া চামড়া ঝুলে পড়া থুতনি, চোখের কোলে নাকের পাশে শাদা শাদা ক্লোরোস্টেরেলের ছাপ—সবই তো বয়েস-মাফিক। তবু যেন রাতে শোওয়ার আগে টান টান করে বেণী বেঁধে, দাঁত মেজে, মুখে বাটা চন্দনের প্রলেপে মনোরমার নারী হয়ে ওঠার আয়োজন।

গভীর রাতে দীপেশ হয়ত একলা জয়জয়ন্তী বাজাবে দোতলার ঘরে। জয়জয়ন্তী বড় প্রিয় রাগ সতীপ্রসন্নর। তাই তার নামটিই মনে এলো। তিনি রাগ সঙ্গীত তেমন বোঝেন না। তবে ঐ যে ভীষ্মদেবের 'ফুলের দিন হলো যে অবসান'-এর রেকর্ড বিঁধে আছে মাথার ভেতর। সেই সবটুকু মিলিয়ে মিলিয়ে বুঝতে পারেন দীপেশ জয়জয়ন্তীতে যাচ্ছে। কখনও বা পরিচিত হিন্দি ফিল্মি গানার সঙ্গে মিলে যাওয়া সুর শুনতে শুনতে বুঝে ওঠা যায় দীপেশ শিবরঞ্জনী, মারু বেহাগ, কি হাম্বির বাজাচ্ছে।

আর তখনই, সমস্ত চিন্তার শৃঙ্খলা ছিঁড়ে, অশ্লীল ভঙ্গিতে জেগে উঠল শব্দ দূষণ। দোতলার ভি সি আর-এ কোনো অমিতাভ বচ্চন, মিঠুন চক্রবর্তী, অমরীশ পুরী, অনিল কাপুর, সানি দেওল অথবা জ্যাকি শ্রফ। বন্দুকে, নাচে, ধর্ষণে—যাবতীয় লোচ্চামির আধুনিক

উপকরণ নিয়ে সশব্দে হাজির। এই ধ্বনিতে মায়া থাকে না। আকর্ষণ থাকে। এবং গানে, অঙ্গভঙ্গিতে শুধুই যৌনতা। এমন শব্দ-তাণ্ডব যদি এত রাতে চলতে থাকে, তাহলে দীপেশ কেমন করে বাজাবে!

অথচ রসিদ ছাড়া, বেশি অ্যাডভান্সের মোটা টাকা দেয়া ভাড়াটেকে কিছু বলা যায় না। মাস পয়লায় টাকা দিতে কখনও ভুল করে না হরবনস। টাকারও তো দরকার থাকে নিয়মিত। আর এক অদ্ভুত আকর্ষণও।

মনোরমা মশারি টাঙিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছেন। একটু পরেই তাঁর নাকের ডাকে ঝড় উঠবে। অন্ধকারে নিজের খাটে একলা চিৎ হয়ে শুয়ে আবছা মতো সিলিং, দৌড়ে চলা ফ্যান, হাওয়ায় ফুলে ওঠা মশারি দেখতে দেখতে সতীপ্রসন্ন সাত-পাঁচ ভাবনায়, বয়স্ক—বৃদ্ধ মানুষের নানা চিন্তা ঘোরাতে-ফেরাতে, ঘোরাতে-ফেরাতে ঘুমে যাবেন।

চার

ডান পায়ের পাতা আর গোছের সন্ধিতে পুরনো এগজিমা রানী মার্কা রুপোর টাকায় বেশ ভালো করে চুলকে নিয়ে অপরাজিতাকে টাটকা পেঁপের কষ লাগিয়ে দিতে বলবেন সুধাপ্রসন্ন। এ এগজিমা তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে থাকতেই। সোরাইসিস থেকে বাঁচাতে গিয়ে ওষুধ দিলেন ডাক্তার। তার পরই দু'পায়ে এগজিমা। এটাকে ওষুধ দিয়ে পুরোপুরি সারাতে গেলে নাকি লিভার ড্যামেজ হয়ে যাবে। তাই আর একে সারিয়ে তোলা হলো না সুধাপ্রসন্নর। গরমে বাড়ে। তখন অপরাজিতার রঙিন ফুলকাটা তোরঙ্গের—যার অনেকগুলি ফুল জং এবং সময় খেয়ে ফেলেছে, তলা থেকে বের করে আনা রুপোর টাকায় চুলকে নিয়ে কাঁচা পেঁপের কষ লাগানো, দু'পায়েই, নিয়ম করে।

হালটানা বলদের চামড়া ফেটে যাওয়া ঘাড় যেমন কালো, তার নিচে লালচে ঘা, অনেকটা সেরকমই কালো এগজিমা সুধাপ্রসন্নর

হু'পায়ে। যেমন সদ্য প্রসূতি নারীর স্তনের বোঁটায় দুধ জমে, তেমনই কাটা পেঁপের কষ। শাদা কষ তুলে তুলে হাতে করে লাগাচ্ছিলেন অপরাজিতা। আরাম পাওয়া যায়। হাওয়া লেগে কষ কিছুটা শুকনো মতো, থকথকে—দানাদার। দুধ শাদা থেকে তার বর্ণান্তর ঘটে, যেন বা ঘোলা তাড়ি-রং। •

এখানকার পরিবহণ সমস্যা নিয়ে কাগজে একটা চিঠির ড্রাফট ভাবছিলেন সুধাপ্রসন্ন। কয়েকদিন তাঁর মাথায় ইংরেজি 'বারসাক' শব্দটি ঢুকেছে। একটু অপ্রচলিত শব্দ পেলেই, তা চিঠিতে লাগিয়ে দেয়ার কথা ভাবেন। হরিদেবপুর, সিরিটি, করুণাময়ী, সোদপুর অঞ্চলের এই যে গাড়ি-বিভ্রাট, রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি, এ নিয়ে কড়া ভাষায় লেখা লেটারস্ টু দ্য এডিটারে 'বারসাক' শব্দটি ঢোকানো যায় কি না ভাবতে ভাবতে বিভোর হয়ে যাচ্ছিলেন সুধাপ্রসন্ন। কিছু আগে বাজার সেরে ফিরেছেন। এ বাজার এখন অনেকটাই গোছানো, টিনের শেডের নিচে জায়গামতো। মাছ মুরগীর মাংসের জন্যে আলাদা, সিমেণ্টের উঁচু বেদী—যেমনটি হয়ে থাকে। তরকারির অঞ্চলটিও সিমেণ্ট ইট বাঁধানো উঁচু টংয়ের ওপর। মাটিতে বিছানো তরকারি-পাতিও আছে। তবে এই বছর দুই আগেও যেমন রাস্তার দুপাশে তরকারি, মাছ, মুরগীর মাংস সাইকেল হাঁটানো যায়না, মোটর বা গোরু ঢুকলে সব এলোমেলো হয়ে যায়, এখন সে অবস্থা নেই। হলুদ টিনের ওপর কালোয় লেখা—করুণাময়ী বাজার। এখানে বড় বাজার বলতে তো করুণাময়ী, নয় সেনহাটি। দুটোই বাড়ির থেকে পনের কুড়ি মিনিটের হাঁটা পথ। কাছাকাছি কালিতলায় যে দু চারটে সবজি এবং মাছঅলা, তারা আক্ষরিক অর্থেই গলা কাটে।

পরিশ্রম, করুণাময়ী থেকে হেঁটে আসার ঘাম এখনও তাঁর কপালে। সকাল থেকে মেঘ ছিল। এখন মেঘলাভাঙা তীব্র রোদে ভাদ্রের মায়া। সূর্যের দিকে তাকানো যায় না, রাংতা রঙের রোদ্দুর দশদিক ঝলসে দিচ্ছিল।

বাড়ি থেকে বেরুলে সরু পিচ রাস্তার ওপারে মেনতু ভাণ্ডারীর

মুদিখানা। সেখানে এখন দৈনিক খরিদ্দার। বেশিরভাগই বাড়ির বৌ-ঝি। একশো গ্রাম সর্ষের তেল, আড়াইশো আলু, পঞ্চাশ গ্রাম মুড়ি, একটা ডিম।

রোদ একটু উঠে এলে বিচিত্র সুরের ফেরিঅলারা হেঁকে যাবে এ রাস্তা দিয়ে। এপথ দিয়ে মুচি যায় না। জুতো সারাতে যেতে হয় সিরিটির মোড়।

—এ, এ হাঁসের ডিম, ডিম চাই, ডিম—বলতে বলতে খাকি জামা আর ধুতি পরা মানুষটি ডিম মাথায় হেঁটে যায়। পাশাপাশি এ-কাগজ, পুরানা লোহা ভাঙা বিক্রি—এরা আসে দখিন থেকে। ক্যানিং, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার। লাল-নীল কার, সেফটিপিন, বেণী-মাধব শীলের হাফ ও ফুল পঞ্জিকা, আদর্শলিপি, বর্ণপরিচয়, লক্ষ্মী আর শনি-সত্যনারায়ণের পাঁচালি, এ. বি. সি. ডি বই নিয়ে সেই বুড়ো মানুষটি, তাঁর কোনো হাঁক নেই।

একটু দুপুর হলেই সাইকেল ভ্যানে কাচের শোকেসে আম, তেঁতুল, চালতা, লেবু, কুলের ঝাল টক তেল মিষ্টি—নানান স্বাদের আচার সাজিয়ে রেকর্ড বাজানো সেই ছেলেটি চলে যাবে। যার ব্যাটারিতে চলা পিনের সুরে মহম্মদ রফি কিশোরকুমার আর লতার গলা—সব এক। এবং এ গাড়িতেই বিলাতি আমড়া, কয়েতবেলের আচার। দুপুরে তার পেছনে দৌড়ে যাওয়া অল্পবয়েস।

এই সব ফেরিঅলারা, তাঁদের হাঁক, সবই পরিচিত এ রাস্তার বাতাসে। কখনও সিরিটির মোড়ে পনের দিনব্যাপী চলচ্চিত্র-উৎসবের রিকশাবাহী বিজ্ঞাপন-কণ্ঠে, অথবা বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাহায্যার্থে পূর্ব পুটিয়ারিতে 'মহাভারতের কৃষ্ণ' যাত্রাপালার ঘোষণায়, টিকিট কেনার আহ্বানে সুধাপ্রসন্নরা অভ্যস্ত হয়ে আছেন। অথচ আজ এইমাত্র যেন বা বেতার তরঙ্গে 'স্বপ্না দাঁতের মাজন'—অত্যন্ত প্রফেশনাল স্বরক্ষেপণে কানে ভেসে আসতেই সুধাপ্রসন্ন চমকালেন। আর একজিমা থেকে ফিরে একটু জোরেই ছাদঅলা বারান্দা পেরিয়ে তিনি দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন খালি রিকশায় শুধুমাত্র

চালক আর মাইক। সিটের ওপর কোনো ঘোষক নেই। কেবল একটি ক্যাসেট প্লেয়ার। পায়ের কাছে বড় কালো ব্যাটারি।

'কালো, তা সে যতই কালো হোক—দাঁত থেকে গিয়েছে লাল-কালো ছোপ।' বলতে বলতে—ঠিক বলা নয়, শব্দ ছড়াতে ছড়াতে সেই ক্যাসেটবাহী রিকশা দূরে চলে যায়। এবং চারপাশে যে শব্দ-মালা ভেসে বেড়ায়, তাতে 'দেখতে কালো হলে কি হবে / এ মাজন আপনার দাঁতকে করে দুধের মতো শাদা আর মাড়িকে করে লোহার মতো মজবুত!'

সুধাপ্রসন্ন দরজা ধাক্কানো একুশ শতক আর টেকনোলজির আগ্রাসন দেখতে পেলেন।

'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটানিতে পি.এইচ.ডি স্বপন দাস দেশ-বিদেশ ঘুরে তাঁর অভিজ্ঞতার শেকড়-বাকড় থেকে তৈরি করেছেন এই কালো দাঁতের মাজন। এ মাজন আপনার মুখের দুর্গন্ধকে দূর করে। দাঁতে ব্যথা, অসহ্য যন্ত্রণা? একবার শুধু একবার স্বপ্না কালো দাঁতের মাজনে মেজে ফেলুন, ব্যথা যে কোথায় পালাবে!'

ক্যাসেট-কথা মিউজিক সহযোগে আবারও পুরনো জায়গায় ফিরে আসছিল। যেন বিবিধ ভারতীয় প্রচারতরঙ্গ। যেমন সেই ষাটের শেষে, অথবা সত্তরের প্রথমে। 'নিকসোডার্ম নিকসোডার্ম নিকসোডার্ম' —এ বিজ্ঞাপন-গানমালা তো সত্যজিৎ রায় তাঁর 'প্রতিদ্বন্দ্বীতে'-ও লাগালেন। কিংবা সঙ্গে সঙ্গে 'দেখলে শুনলে একটিবার/চাইবেন মারফি ট্রানজিস্টার' বা 'স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে লাইফবয়।'

সুধাপ্রসন্ন দরজা থেকে সরে এলেন। টেকেনোলজির এই আক্রমণ তাঁকেও কিছুটা হতবাক করেছে।

রাস্তার ওপারে মেনতু ভাণ্ডারীর দোকানে তখনও অনেক ভিড়। মেনতু তার নিজস্ব কায়দায় বা-বা, ও—বৌদি ইত্যাদি শব্দে মহিলা খরিদ্দারদের আটকে রাখছে। যেমন রোজ হয়ে থাকে। আর তখনই যেন বাঁশবাগানের সবুজের মাথায় জমে থাকা কালচে বৃষ্টিবতী মেঘ বর্ষণ হয়ে নামল সুকান্ত পল্লী আর সিরিটির মাথায়।

—সব কাপড় ভিজে গেল, বলতে বলতে মনোরমা উঠোনে দৌড়ে এসে আধ শুকনো কাপড়-গামছা তুলতে তুলতে নিজেই খানিকটা ভিজে গেলেন।

তারপর বৃষ্টি থেমে গেলে, মিনিট পনের পর মেঘলা ভাঙা রোদে এই উঠোনের তারে বৃষ্টির জমা জল পোখরাজ দানা হয়ে ফুটেছিল। গোটা বাতাস জুড়েই এখন আর্দ্র ঘ্রাণ। সুধাপ্রসন্ন ডিকশনারি নিয়ে চিঠির ড্রাফটে যাওয়ার আগে দেখতেও পেলেন না টালির চালে কুমড়োলতার গায়ে দুটি হলুদ প্রজাপতি এই রোদের রং শুষে নিচ্ছিল ডানা নেড়ে নেড়ে। সেই আন্দোলনে ছায়াও ছিল।

পাঁচ

কলকাতা উত্তরে এবং দক্ষিণে কতটা ছড়িয়েছে, তার হিসেব ঠিক ঠিক বলে দেয়া বেশ মুশকিলের ব্যাপার। দক্ষিণে হরিনাভি, শিবরামপুর, হরিদেবপুর, বোড়াল, ব্রহ্মপুর, জোকা, সোনারপুর, সুভাষগ্রাম, সবই বলতে গেলে কলকাতার কাছেই। আর উত্তরে দমদম বাগুইহাটি, সল্ট লেক, লেক টাউন, পুবে ইস্টার্ন বাইপাস। কলকাতা এভাবেই মফঃস্বলকে গ্রাস করতে করতে হাত-পা ছড়াচ্ছে। হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে জমির দাম। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে নিয়মিত নতুন নতুন হাউসিংয়ের খবর। স্কোয়ার ফুট হিসেবে কভারড অঞ্চলের কস্টিং। বিশেষ করে রবিবারের পাতায়।

কলকাতার এমনই এক এক্সটেনশন সিরিটি থেকে হাজরা আসতে সময় লাগে মিনিট কুড়ি। কিন্তু বাসের জন্যে দীপেশকে অন্তত আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল নবতরুণ সংঘের বাস স্টপে। সেই পাউডার পাফ চেহারার সুগন্ধী ফুলেরা এখন আর গাছে নেই। সেখানে শুধুই স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল সবুজ পাতারা। এই রুটের এ এক গোলমাল। একটা বাস ফসকে গেলে দাঁড়াও কুড়ি মিনিট কি আধ

ঘণ্টা। দুপুরে তেমনভাবে অটোও দেখা যায় না। প্রাইভেট বাস একুশ নম্বর কখনও-সখনও, আর সরকারি ফোর-সি ঐচ্ছিক।

নবতরুণ সংঘের স্টপে দাঁড়িয়ে সিরিটি শুকতারা সংঘের মোড় পর্যন্ত দেখা যায়। ইদানীং ফোর-সি এসে এখান থেকেই ছাড়ে। করুণাময়ী বাজার যাওয়ার রাস্তায় ব্যাপক খোঁড়াখুঁড়িতে হরিদেবপুর পর্যন্ত সরকারি বাসরুট এখানে এসেই আপাতত থমকে গেছে। মিনিট দুই আগে একটা ফোর-সি ধর্মতলা থেকে যাত্রী বোঝাই হয়ে এসে এই মোড়ে দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে 'গ্যারেজ' এই লেখাটুকু কপালে লাগিয়ে চলে গেল চৌরাস্তার দিকে।

অপেক্ষা করতে করতে দীপেশ শেষ পর্যন্ত অটোতেই চেপে বসল। এখান থেকে মহাবীরতলা এক টাকা চার আনা। সিরিটির মোড় থেকে এক টাকা। বহু অটো লাইসেন্স পেয়েছে এই রুটে এবং নানা রুটে। ফলে রিকশাঅলাদের বাজার কিছু মন্দা। সিরিটির মোড় থেকে বাঁদিকে মহাবীরতলার দিকে মুখ ঘোরাতেই একটু এগিয়ে সিরিটি শ্মশানের আগে নিচু জলাভূমিতে গোটা আকাশকে আর একটা আকাশ হয়ে ভেসে থাকতে দেখতে পেল দীপেশ। এখন অনেক রোদ দুই আকাশেই। জলার ওপারে কাঁচা ঘর, কলাবাগান, সবুজ, সিরিটি শ্মশানের শেষ না হওয়া নতুন কনস্ট্রাকশান, সবই এ রোদে আলাদা আলাদা মাত্রা পেয়েছে। নীল, সবুজ, ধূসর—নানান রঙের উজ্জ্বল কম্বিনেশান।

মহাবীরতলা পৌঁছে, ব্রিজটুকু হেঁটে পেরিয়ে একটা চব্বিশ / ঊনতিরিশ ট্রাম পেয়ে দীপেশ লাফিয়ে উঠল। আর চলন্ত ট্রাম তাকে রাসবিহারী পৌঁছে দিতে তেমন দেরি করল না। এমন কি ভবানী সিনেমা থেকে টালিগঞ্জ ব্রিজ পেরনো পর্যন্ত জ্যামের যে নিত্য জটিলতা, তা-ও তাকে আজ আটকাতে পারে নি।

রাসবিহারীর মোড় থেকে কাঁকুড়গাছির টানা ট্যাক্সি পাওয়া বেশ শক্ত। শেয়ালদা পর্যন্ত ট্যাক্সিতে এলো দীপেশ। ল্যান্সডাউন, বেকবাগান, কলামন্দির, মল্লিক বাজার, পার্কসার্কাস হয়ে। সেখান

থেকে আবার ট্যাক্সি বদলে কাঁকুড়গাছি।

রাস্তার ওপরেই বাড়ি। সামনে কোলাপসবল। গেটে দাঁড়িয়ে কথা বলতেই ডোবারম্যানের গম্ভীর ডাক। মঙ্গোলিয়ান মুখের দারোয়ানের ভাবলেশহীন চাউনি।

আকাশে অল্প অল্প মেঘ করেছে। তবু কোথাও যেন চোরা আলো থেকেই গেছে। টোরকটের পা সরু আলিগড়ি, তার ওপর চওড়া শাদা কাজ করা, শাদা তানজেবের কুর্তা—এই সেদিন লক্ষ্ণৌ গিয়ে কেনা। গা থেকে চন্দনের সুগন্ধ।

ঝাঁকড়া চুলের দু-এক কুচি ঘামে লেপটে গেছিল চওড়া কপালের জমিতে। এখন বিকেল তিনটে। তানজেবের কুর্তার নিচে সামারকুল স্যাণ্ডো গেঞ্জি ভিজে একেবারে ন্যাতা। টপ টপ করে ঘাম গড়াচ্ছে।

মঙ্গোলিয়ান মুখকে একটু গলা খাঁকরে দীপেশ বলল, মণিমালা! শুধু এটুকু বলাতেই দুপুর তিনটেতে কোলাপসবল খুলে যায়, সে মন্ত্র দীপেশের আগে জানা ছিল না। এবং লোহার গেট, মঙ্গোলিয়ান শরীর পেরিয়ে কাঠের একপাল্লার সামনে দাঁড়িয়ে বাহারি, পাখি-ডাকা কলিংবেল টিপতেই আবারও ডোবারম্যানের গম্ভীর আওয়াজ।

দরজা খুলে দিয়ে যে কিশোরী কাকে চাই জিগ্যেস করে, সে দীপেশকে দেখে যেন বা একটু সচকিতই। মণিমালাদের সণ্ট লেকের ফ্ল্যাটে দু-একবার একে দেখেছে দীপেশকে। মঙ্গোলিয়ান একেবারেই নতুন, এ বাড়িতে রিক্রুটমেণ্ট।

দীপেশ তবুও সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে পারছিল না।

কিশোরী বলল, আসুন।

বেলার তুলনায় সিঁড়িতে যথেষ্ট অন্ধকার। এ বাড়ির দক্ষিণ-পুব কি চাপা? আজ কলকাতায়, বা কলকাতার কাছে এসব নিয়ে ভাবতে পারে মানুষ! কোনোরকমে যা পাওয়া যায়, সেখানেই মাথা গোঁজা।

পাপোষের বাইরে নিজের বাহারি কোলাপুরী ছাড়তে ছাড়তে দীপেশ অরুণকে দেখতে পেল। তারই ক্লাস মেট। কিন্তু কেমন যেন একটু বয়স্ক দেখায়, হয়ত দুপুরে ঘুম থেকে ওঠার জন্যে।

মালটিন্যাশনাল কোম্পানির দামী সেলস এগজিকিউটিভ অরুণ।

এসো দীপেশ, বলতে বলতে অরুণ ভেতরে টানে দীপেশকে। বাড়িতে পরার ঢোলা পাজামা-পাঞ্জাবিতে অরুণকে আরও মোটাসোটা, ঢলঢলে, জবর-জং লাগছে। এবং মণিমালা, যাকে দীপেশ কখনও অরুণের সুরে 'দোলন' বলে ডেকে অরুণকে কিছু ঈর্ষান্বিত, অস্বস্তিতে ফেলে।

হালকা আকাশ রং ম্যাকসির ওপর ভারি হাউসকোট জড়ানো মণিমালা, না কি দোলন, মিনিট দশ পরে এ বাড়ির দোতলার ড্রইং রুমে এলে বাতাস সুরভিত হয়ে ওঠে। দীপেশ টের পায় দোলন তার প্রিয় পারফিউম জেসমিন আতর মেখেছে।

ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়া একটু খয়েরি মতো স্টেপকাট! লম্বা ম্যানিকিওর করা নখে কপালে ঝামরে আসা চুল মাঝে মাঝেই পেছনে সরিয়ে দিচ্ছে দোলন। অরুণের পাইপে ফ্লাইং ডাচম্যান পুড়ছিল। ঘ্রাণে তার স্বাদ অনুভব করে দীপেশ।

পাইপের আগুন মাঝে মাঝেই নিভে যায়। দামী বিদেশী লাইটারে মালটিন্যাশনাল কোম্পানির সেলস এগজিকিউটিভ অরুণ পাইপে আগুন আনছিল।

দীপেশ খুবই ক্যাজুয়াল স্মোকার। কিন্তু পোড়া তামাকের গন্ধে রক্তে সংক্রমিত হতে থাকে নেশা। নিজেকে অরুণের সামনে আরও কিছুটা যোগ্য পুরুষ করে তোলার জন্যেই দীপেশ তার কিং সাইজ ফিলটার ধরালো! দোলন একটু উঠে ভেতরের ঘর থেকে তার নিজস্ব ব্যাগের সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে আসে। পোড়া তামাকের গন্ধে এ ঘরের বাতাস ছয়লাপ।

দোলনের লম্বাটে, নরম তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে সিগারেট পুড়ছিল।

তুমি আসবে বলেই অফিস কামাই করেছি। বলতে বলতে অরুণ তার পাইপের ওপরদিকে জমে থাকা ফ্লাইং ডাচম্যানের ছাই ঝাড়ল। তলার তামাকটুকুতে আবারও অগ্নিসংযোগ। তামাক যত পোড়ে,

নেশা তত জমে।

টেবিলের অ্যাশপটে সিগারেটের অগ্নিমুণ্ড গুঁজে দিতে দিতে দীপেশ বলল, আমার বাড়িতে প্রিয়ব্রত দু'লাইনের একটা চিরকুট রেখে এসেছিল দোলনের। এবং এই দোলন বলে ফেলেই অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে আরও একবার যেন সুখে ডুবল দীপেশ। ঈর্ষা জাগিয়ে তুলেও তো কখনও কখনও সুখ পাওয়া যায়।

আমি টি. ভি সিরিয়াল-এর পাইলট জমা দিয়েছি। দোলনের সিগারেট পুড়তে পুড়তে শেষ হয়ে আসছে। দীপেশ সোজাসুজি দোলনকে দেখল।—তোমাকে মিউজিক করতে হবে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথের গল্প, তাই মিউজিকটা খুব ইমপর্ট্যান্ট।

শ্যাম্পু করা ঝাঁকড়া চুলের ভেতর আঙুল ডুবিয়ে দীপেশ বলল স্ক্রিপট কে করছে?

আমি, বলতে বলতে দোলন এক সিগারেট থেকে অন্য সিগারেটে চলে গেল।

কটা এপিসোড?

গোটা তের ভেবেছি আপাতত।

ফার্স্ট চ্যানেলে, নাকি?

ফার্স্ট চ্যানেল ছাড়া আবার কেউ দেখে নাকি? অরুণ এভাবেই তাদের কথায় নিজেকেও পার্টি করে তুলতে চাইছিল। আর একথারই জের টেনে, পাইপ ঠোঁট থেকে নামিয়ে—নেহাৎ স্টেফি-মার্টিনার খেলা, উইম্বলডনে বরিস বেকারের ক্যারিশমা, সার্ভিস, স্ম্যাশ দেখার জন্যে লোকে সেকেণ্ড চ্যানেল ঘোরাতে পারে, নয়তো নিজের বা চেনাজানা কারোর যদি কোনো প্রোগ্রাম থাকে।

আমি এন. এফ. ডি. সি-র টাকারও চেষ্টা করছি। ফুল লেংথ টি. ভি ছবি করব। গল্পও বাছা হয়ে গেছে। কিন্তু এরও মিউজিক তোমাকে

এতগুলো মানুষের গলার মধ্যে এ বাড়িতে মাঝে মাঝেই ডেকে ওঠে ডোবারম্যান। চারপাশে আর কোনো শব্দ নেই। কোন এক ফাঁকে ফ্রিজের ঠাণ্ডা কোল্ড ড্রিংকস আর সল্টেড কাজুর প্লেট রেখে

গেছিল সেই কাজের কিশোরী। একটা দুটো কাজু দাঁতে কেটে, ঢক ঢক করে কোল্ড ড্রিংকস ভেতরে চালান করে জুড়োতে চেয়েছিল দীপেশ। বাতাসে গরম ছিল।

এবং এভাবেই এক সময় বিকেল এসে গেলে আড্ডায় আড্ডায় সন্ধের ফিকে ঘোর নামার আগে অরুণ কি খাবে, স্কচ না ওয়াইন—এটুকু বলে দীপেশকে আটকে দেয় আরও কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর স্কচ আর কাজের মেয়েটির হাতে তৈরি বটি কাবাব, ফ্রিজে রাখা একটা দুটো ঠাণ্ডা শসা আর আপেলের টুকরো, দু এক দানা কাজু কাটতে কাটতে কেন জানি না দোলনের ফান মানচ নামের বিজ্ঞাপন-বন্দিত, ঝকঝকে প্যাকেট বন্দী পটাটো চিপসটির কথা মনে পড়ে। যে কাজের মেয়েটি বটি কাবাব বানায়, ফ্রিজ থেকে বরফ বের করে এনে বড় চীনা মাটির বোল্-এ রাখে, স্টিলের ছোট চিমটে দিয়ে বরফ তুলে দেয় ড্রিংকসের গ্লাসে, সে-ই এবাড়ির সামনের দোকান থেকে ফান মানচ-এর প্যাকেট আনে।

দাঁতে বাহারি, শক্ত প্যাকেট ছিঁড়ে, দোলন একটু যেন চোখের কোণের হাসি আর এক মুঠো আলু ভাজা দীপেশের হাতে তুলে দিতে দিতে অনেকটা নুয়ে পড়ে। অন্তত পনের বছরের পরিচিতিতে, দুটি বাংলা ছবির ফ্লপ নায়িকা, আপাতত টি ভি সিরিয়ালের স্বপ্নে বিভোর থাকা নিঃসন্তান দোলন মালটিন্যাশনালের ঘ্যাম এগজিকিউটিভ অরুণের সঙ্গে লিভ টু গেদার খেলতে খেলতে ক্লাব, পার্টি, ডগ শো-র ফাঁকে ফাঁকে দীপেশকে প্রায়ই খবর পাঠায় প্রিয়ব্রত মারফৎ। তার টি. ভি ইউনিটের একজন প্রিয়ব্রত।

হা-হা, ফান মানচ! আলু ভাজার স্বাদ দেখেছে। বিদেশী টেকনোলজি। সুইজারল্যাণ্ড প্যাকিংটা বলো—বলতে বলতে অনেকগুলো আলু ভাজা মুখে পুরে চিবোয় অরুণ। তার ডান হাতের তিনটি আঙুলে ফান মানচের গুঁড়ো মশলা। আলাদা করে চেটে খেলে জিভের স্বাদ ফেরে। ফিকে টকে, হালকা ঝালে অ্যালকোহল আর টোবাকোর জড়তা কাটে।

তুমি বেশি আলু খেওনা। সামনের মাসে একবার ব্লাড না করিয়ে—দোলনের এই অনুশাসন ফেনায়িত আড্ডায় কোনো পুরুষই শুনতে চায় না। অরুণও তার সহজীবনের আপাত সঙ্গিনীকে তেমন পাত্তা দিল বলে মনে হয় না। চোখের কোণে জমে থাকা লালিমা গ্লাসে ডুবে যায়। কথারা শুধু কথা হয়েই বাতাসে ভেঙে ভেঙে মিশে যেতে থাকে।

গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে অরুণ দীপেশের কাছে সিগারেট চায়।

আসলে আয়ু, জেদ, অর্থ, ঈর্ষা, বেঁচে থাকার দৌড় এবং নেশা, কখনও ইঁদুর-দৌড়ে সাময়িক পিছিয়ে পড়ে মৃত্যুর জন্যে আকাঙ্ক্ষা—এসবই অন্যান্য অ্যালকোহল-আড্ডার মতো এখানেও ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিল।

শুধু জল, বরফ, সোডা, নতুন মদ, তামাক বা টাকনা ছাড়াবার শুকনো চাটই নয়, বারবার তারা নিজেদের একই জীবনের নানান প্রসঙ্গ বদল করছিল।

একটু রাত হলে নেশাও অনেকটা জমে আসে। ক্লাব বা বারে না খেলে সেই ভাবে কোনো পেগের মাপ থাকে না। পাঁচ পেগের মতো স্কচ খাওয়ার পর দীপেশের একটু যেন এলোমেলো মনে হয় নিজেকে। এ জীবনে, গুরুজির কাছাকাছি, অথবা তার চেয়েও বড় সরোদ বাজিয়ে হাওয়ার স্বপ্ন দেখা দীপেশ দোলনের কি একটা কথায় হা-হা হাসিতে ভেঙে পড়লে তার চোখে জল জমে। এবং রাত আরও বেড়ে গেলে স্নায়ুর শিথিল বিন্যাসে, সামান্য এলোমেলো হয়ে যাওয়া চুলে, শাদা পাঞ্জাবিতে বটি কাবাবের হলুদ, ফান মানচের গুঁড়ো মশলার দাগ নিয়ে দীপেশের উঠে পড়া।

বেরিয়ে আসার আগে বাথরুমে গিয়ে তলপেট হালকা করে ফ্ল্যাশ টেনে দিয়ে চৌকো আয়নায় নিজের নিখুঁত কামানো, ভারি, লালচে গাল, সামান্য থমথমে মুখ দেখতে পায় দীপেশ। তার চোখের কোণে তখনও হাসির রেখা, জল।

ঘরের মেঝেয় পাখার হাওয়ায় ছুটে বেড়ানো ফান মানচের খালি

প্যাক, সিগারেটের প্যাকেট, রাংতা, কিছু ছাই।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালো অরুণ। দীপেশ কোলাপুরীতে পা গলাচ্ছে। আর দোলন তার চাওড়া হাতের উষ্ণ পুরুষালী পাতাটুকু এই আজকে শেষবারের মতো ধরতে পেরে বুঝি বা কিছু সান্ত্বনা পেল, এমন ভাবে নিজের পেলব করতলে বন্দী করে, আন্তরিকতায় আবার কবে আসছ বলতে বলতে স্থির চোখে দীপেশের দিকে তাকায়। তখনই নিচে থেকে ডোবারম্যানের চিৎকার বাঁচাতে বাঁচাতে, আমি আমি বলা যে বুশ শার্ট আর ফুল প্যান্ট পরা তরুণ ভি. ডি. ও ক্যাসেট নিয়ে ঢোকে, তার দিকে তাকিয়ে, দীপেশের করতলে নিজের হাত বন্দী রেখেই দোলন, নাকি মণিমালা বলে ওঠে—কি ক্যাসেট আনলি? দীপেশ ততক্ষণে হাত সরিয়ে নিয়েছে।

সিঁড়ির এই কম পাওয়ারের ডুমে দোলন মণিমালা হয়ে যায় ক্যাসেটের নাম শুনে।—নাহ্, তেজাব আমি দেখব না, পঞ্চাশ বার দেখা। গরীবোঁ কা দাতাও না। তোকে বললাম কোনান দ্য বারবারিয়ানস দেখতে, নয় তো লস্ট এম্পায়ার।

সব বেরিয়ে গেছে। বলতে বলতে ছেলেটি দু'হাতে বন্দী চৌকো, নাকি আয়তাকার ভি. ডি. ও ক্যাসেট এদিক-ওদিক করে নাচাতে থাকে।

না, সব ফেরৎ নিয়ে যাও। এমন কি ক্র্যামার ভার্সেস ক্র্যামার পেলেও আমি দেখব। এসব ওঁচা বোম্বাইয়া হাঙ্গামা

ছেলেটি আর দাঁড়ায় না। সিঁড়ির মুখে নেমে যেতে যেতে তার শিস-ধ্বনিতে 'মাই নেম ইজ লখন/মাই নেম ইজ লখন/সজনোঁকা সজন মেরা নাম হ্যায় লখন/এজি ওজি তুম ভি শুনোজি'-এর সুরটুকু শুনতে পায় দীপেশ।

দোলন হাউসকোটের কাপড়টুকু গলার কাছে টেনে এনে, আরও নগ্নতা ঢেকে, এ নগ্নতাটুকু কাল্পনিকই বা গর্বের—নিজেকে আকর্ষণীয়, আরও আকর্ষণীয় করার প্রচলিত নারী-অভ্যাসে সহজ গলায় মণিমালা হয়ে যেতে যেতে বলে ওঠে—আবার এসো দীপেশ।

অরুণ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে, বায়, সি ইউ এগেইন।
এবং দীপেশের উত্তরের সঙ্গে ডোবারম্যান ডেকে ওঠে।

সন্ধের পর লোডশেডিং হয়ে গেলে মজলিশ আরা রোডের এ বাড়িতে কিছু বাড়তি অন্ধকার। লম্বা, টানা বারান্দার একপাশে খাওয়ার টেবিল। পাশাপাশি দু'জন বসে খেতে পারে বড় জোর। একদা এ টেবিল প্রত্যুষপ্রসন্ন বা প্রদোষের পড়ার জায়গা ছিল। তার ওপর এখন ফুলকাটা প্লাস্টিক শিট, রঙিন। যাতে তেল-মশলা, এঁটো-কাঁটায় ময়লা কম হয়, সেজন্যে অপরাজিতার এ ব্যবস্থা। রাতে খাওয়ার পর সেখানে গুছনো থাকে পেস্ট, ব্রাশ, হরিণঘাটার দুধের কার্ড—পরের সকলের জন্যে।

এই বারান্দাতেই চিমনি মুছে, পরিষ্কার আলো দেয়া একটি হারিকেন রেখে যান অপরাজিতা। কলেজ স্ট্রিট থেকে এখনও ফেরেন নি সতীপ্রসন্ন। সুধাপ্রসন্ন নিজের ঘরে আলু সেদ্ধ দিয়ে মুড়ি খাচ্ছিলেন। এ বয়েসেও তাঁর সুগার নেই, মোটা হয়ে যায়নি।

এই অন্ধকারে, টিনের বেঁটে গেট ঠেলে খুলে, বড় অক্লেশে এ বাড়ির অভ্যন্তরে চলে এসেছিল শ্যামল।

সেলস প্রোমোশনের জন্যে সেলসম্যানকে কিছু দুঃসাহসী হতেই হয়। শ্যামল এটুকু জানে। তার আঠাশ বছরে এই সবে চাকরি, ফলে রিস্ক তো কিছু নিতেই হয়।

গেটের শব্দে সুধাপ্রসন্ন মুড়ি আলু সেদ্ধমাখা হাতে তিন ব্যাটারির টর্চের বোতাম টিপে—কে, কে এলো—বলতে বলতে বাইরে।

দীপেশের এই ঠিকানা খুঁজে বার করতে শ্যামলের বেশ অসুবিধেই হয়েছে। তবলচি স্বপ্নেশ মিত্র শ্যামলের মামার বন্ধু। শ্যামল স্বপ্নেশের কাছ থেকে মামার মাধ্যমে ঠিকানা পেয়েছিল।

কুকুর নেই তো—এ শব্দ কটি নিজের ভেতর চিবিয়ে ফেলেছিল শ্যামল। কারণ সেলস প্রোমোশনের দায়িত্ব নিয়ে সল্ট লেকের এক বাড়িতে এমনই রাত করে গিয়ে, মালিকের সঙ্গে কথা বলবে কি!

বিশাল এক গোল্ডেন রিট্রিভার তার কাঁধের ওপর উঠে অক্লেশে গাল চেটে দিচ্ছে। তার হ্যা-হ্যা করা ভয়ানক লাল জিভ, ঝিলিক দিয়ে ওঠা ভয়াল শ্বদন্ত, এবং মুখ গহ্বর থেকে উঠে আসা ইঁদুর পচা দুর্গন্ধ শ্যামলকে ত্রাসে ফেলেছিল। ভারি শরীরের সামনের দুপায়ের চাপে শ্যামল যেন কুঁজোই হয়ে যায়। তার নড়ার উপায় নেই। কাছাকাছি বাড়ির মালিক নেই।

এরাই গুলি খাওয়া বুনো হাঁস দাঁতে আলগা চাপ দিয়ে তুলে আনে জল থেকে সাঁতার কেটে। এসবই বইতে পড়া দিল শ্যামলের।

বিল সাঁতরে উঠে আসছে বড়, ভারি গোল্ডেন রিট্রিভার। তার মুখে ঘাড় ভাঙা হাঁস বা অন্য পাখি। গায়ের দীর্ঘ রোমরাজি থেকে জল গড়াচ্ছে। এ ছবিটি দেখা ছিল।

ঘরের বাতাসে তখন লোম উড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুর কুকুর গন্ধ। শ্যামলের কিছু করার ছিল না।

সেই স্মৃতি থেকে কিছু ভয়াবহ আলোছায়া থেকেই গেছে, তাই মনে মনে কুকুর নেই তো বলে শ্যামল বলল, আমি। দীপেশদা আছেন?

আমি! আমি কে? মুখের ওপর জোরালো তিন ব্যাটারির ঝাঁঝ।

আলোটা সরান, চোখে লাগছে। বলতে বলতে শ্যামল বারান্দার মেঝেতে তার চ্যাপটা ব্রিফ কেস নামিয়ে রাখল।

কি ব্যাপার? সুধাপ্রসন্ন আচমকা একটু যেন ভয় পেয়েই গলায় ঝাঁঝের মাত্রা বাড়ালেন!

দীপেশদা আছেন? দীপেশ ঘোষ। আমি ওর বন্ধু স্বপ্নেশ মিত্রর কাছ থেকে আসছি।

দীপেশের ফেরার কোনো ঠিক নেই, তুমি বাবা বরং কাল···

না মেসোমশাই, আপনাকে হলেও হবে—বলতে বলতে শ্যামল তাঁর নতুন কোম্পানি 'থাণ্ডার'-এর ইনভারটার নিয়ে বলতে থাকে।

এই লোডশেডিংয়ে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। ধরুন, দুশো ওয়াট

চালিয়ে দেবে আমাদের 'থাণ্ডার' ইনভারটার। ছুটো লাইট একটা ফ্যান, চারটে লাইট, একটা টি.ভি, একটা লাইট—সবই চালাতে পারেন আপনি! আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। আলাদা সাইজ। সেই মতো দাম। টানা পাঁচ ঘণ্টা চলবে। তারপর চার্জ হয়ে যাবে অটোমেটিক। ভীষণ দরকার বুঝলেন, তাছাড়া দীপেশদা শিল্পী মানুষ, দীপেশদার কাকা কাগজের এডিটর—ওঁদের সব সময় আলো-পাখা দরকার।

শ্যামল খুব সহজ, পরোপকারী আর ঘরোয়া হতে চাইছিল।

কুলকুল করে ঘামছিলেন সুধাপ্রসন্ন। লাইট ফ্যান না থাকলে সত্যিই তাঁর কষ্ট হয়। এই চুয়াত্তর পঁচাত্তর বছরের জীবনে এটুকুই লাকসারি। গরমে সত্যি সত্যিই বড় অসুবিধে।

শ্যামল এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। হারিকেনের হলদে মতো আলো তার মুখের একপাশে। নিখুঁত কামানো গাল, মোটা গোঁফের একদিক অন্ধকারে ডুবে আছে। চুলে পরিষ্কার তিনটে থাক, বাঁদিকে সিঁথি। ফুল হাতা শাদা সার্ট গুঁজে পরা। কোমরে চামড়ার সরু হাল ফ্যাশানের বেল্ট। বেল্টের ঝকঝকে পেতলের আংটা এ অন্ধকারেও ফুটে উঠছে। ছাই রং ব্যাগি প্যান্টে ছুটো প্লিট ছু'পাশে। পায়ে নর্থ স্টার।

মেইনটেনেন্সের জন্যে ভাববেন না মেসোমশাই। ডিস্টিলড ওয়াটারের শিশি থেকে ব্যাটারিতে জল ভর্তি করে দিলেই হলো। আর আপনি যদি মাস গেলে দশ বা পনের টাকা মেইনটেনেন্স চার্জ দেন, তাহলে আমাদের লোক এসেই সপ্তাহে সপ্তাহে চেক করে ব্যাটারিতে জল ভরে দিয়ে যাবে, মুছে দেবে। তাতে আপনার ব্যাটারির গ্যারান্টির সময়ও বাড়িয়ে দেব। ছু'বছরের জায়গায় তিন বছর।

সমস্ত সেলসের মানুষদের কথাতেই একটি নির্দিষ্ট সম্মোহন থাকে। নিজের বাল্যে, নাকি কৈশোরে রাস্তায় চা করে করে খাওয়ানোর স্মৃতি, বিনা পয়সায় ডালডায় ভাজা লুচি খাওয়ার স্বাদ—এও এক প্রচারের অঙ্গ ছিল, সুধাপ্রসন্নর মনে আছে। এবং মনে হয়

এই তো সেদিন—তাঁর মধ্য বয়েসে বাড়িতে সার্ফ-রমণীরা। নমুনা প্যাকেট, রঙিন ফুলছাপ রুমালসহ। সেই চা, সেই ডালডা, সেই সার্ফ বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের নিত্যসঙ্গী! প্রচার-বিজ্ঞাপন এমন করেই অভ্যাসে মিশে যায়।

শ্যামলকে বসতে বলবেন কিনা বুঝে উঠতে পারছিলেন না সুধাপ্রসন্ন। ইদানীং দুপুরে বিজ্ঞাপন-নারীরা বাড়ির দরজা ঠেলে প্রায়শই ভেতরে। গুঁড়ো সাবানের সঙ্গে প্লাস্টিকের জগ। নয়তো স্টেনলেস স্টিলের গ্লাস। কখনও তিন প্যাকেট গুঁড়ো ডিটারজেন্ট কিনলে পলিথিনের রঙিন বালতি। এইসব মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে সরিয়ে দেয়া যুদ্ধ জেতার মতো। সবাই প্রায় নেই-আঁকড়া, নাছোড়। পেটের টান এমনই টান।

অন্ধকারে শ্যামল তার ইনভারটার-কীর্তন থামিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা প্রডাক্ট-এর ব্যাপারে কিছুক্ষণ বলার পর বিরতি দিতে হয়। শ্যামল এখন সেই ইন্টারভ্যাল-এ। প্রডাক্ট-এর গুণাবলী বলার পর শেষে তার দাম বলে দেয়া—খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে, এমনই নিয়ম। তার আগে পার্টিকে নির্দিষ্ট জিনিসটির বিভিন্ন গুণ বলে বলে ভিজিয়ে দেওয়া। এই শিক্ষাটি শ্যামলের অভ্যাসে রপ্ত হয়ে গেছে।

এরকম পরিচিত জনেদের কাছ থেকে তাদের অল্প বা বেশি পরিচিতদের ঠিকানা নিয়ে হানা দেয় শ্যামলেরা। মাল বিক্রির জন্যে। 'থাণ্ডার' ইনভারটার নতুন মার্কেটিং করছে। তাই অনেক পরিশ্রম। দেড়শো ইউনিটের ইনভারটারের দাম চার হাজার। দুশো ইউনিট সাড়ে চার হাজার। দুই থেকে আড়াই পার্সেন্ট কমিশন শ্যামলের। এছাড়া আলাদা মাস মাইনে আছে। দেড়শো কেন, দুশোই নিন না, তাতে তো লাভ আপনারই, এমনও বোঝাতে হয় খরিদ্দারকে।

তুমি একটু বসবে, দীপেশ আসুক। বলতে বলতে সুধাপ্রসন্ন বাইরের দিকে তাকালেন। সেখানে অন্ধকারে একটি দুটি তিনটি জোনাকি, আলোর ফুল।

পলিক্রলের পুরনো, খালি শিশিতে কেরোসিন, আর তাতে

ডোবানো ছেঁড়া ধুতির পলতে জ্বালা লম্ফ হাতে রান্নাঘর থেকে বারান্দায় আসছিলেন মনোরমা। সন্ধ্যার পর লোডশেডিং হয়ে গেলে তাঁর মেজাজ সপ্তমে থাকে। হারিকেনের আলোয় শ্যামলের কোমর পা, এই সব তেমন করে পরিষ্কার দেখা যায় না। চারপাশে কোনো হাওয়া নেই। এক হাতে টর্চ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুধাপ্রসন্ন। টর্চের বোতাম নেভানো।

কে এলো, কে—বলতে বলতে মনোরমা কাচের লম্ফ নিয়ে সামনে। কেরোসিনের আলোয় ধোঁয়ায় মনোরমার শাড়ি, গাল, শরীরের জায়গায় জায়গায় আলোকিত আলপনা। পাশাপাশি অন্ধকারও।

ও দীপেশের কাছে এসেছে, বলতে বলতে সুধাপ্রসন্ন মনোরমার দিকে ফিরলেন।

দীপুর তো আসতে রাত হবে, কথাটা আন্দাজে বলেই, তিনি আলো ঘুরিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার আগে,—ও বাবা তোমার কি দরকার, একটা কাগজে নয় দু'লাইন লিখে, আমায় নামটা বলে যাও।

সেলসের লোককে কখনও রাগতে নেই। শ্যামল নিজেই বুক পকেট থেকে পেন আর ব্রিফকেস খুলে এক টুকরো কাগজ বের করে দু'লাইন লিখল দীপেশকে। সম্বোধনে ইংরেজিতে ডিয়ার। তারপর বাংলায় দীপেশদা।

এবাড়ির চারপাশে, উঠোনে এত সবুজ, যে শ্যামল বলতেই পারে না এই 'থাণ্ডার'-এরই সিস্টার কনসার্ন 'লস্ট হরাইজন', তারা হোটেল, বাড়ি, স্টেশন সাজিয়ে দেয় সবুজ গাছে। রঙ্গন, রবার, আরও নানান ধরনের কাঁচ বৃক্ষ-চারা। মানুষ তো তার ঘরে, ইটকাঠের স্বল্প আয়তনের ভেতর সবুজকে ইদানীং ফ্যাশনেও রাখে। গাছের বিক্রিও প্যাকেজ হিসেবে। তার মেইনটেনেন্সের খরচ আলাদা। বদ্ধ জায়গায় আলো-হাওয়ার অভাবে ক্লোরোফিল তৈরি করতে না পেরে স্বাভাবিক খাদ্যের ঘাটতিতে সবুজ কমে গাছ নেতিয়ে গেলে, তাদের নার্শারি থেকে নতুন গাছের রিপ্লেসমেণ্ট। কলকাতার সবুজ ধ্বংস করে মানুষ এখন রুফ

গার্ডেন, ব্যালকনি গার্ডেনের ভাবনায়।

এই সবুজের স্বপ্ন দেখানো শ্যামল আপাতত স্থগিত রাখল।—আসি মেসোমশাই, বলতে বলতে শ্যামল ব্রিফ কেস হাতে টিনের দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নামল। আরও মিনিট ছয়-সাত হেঁটে তাকে বাস বা অটো ধরতে হবে।

এ ধারাবাহিক বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে, অন্ধকারে ইনভারটার জ্বেলে একটি আলোকিত দ্বীপ তৈরি করলে মন্দ লাগত না। কিন্তু আসলে টাকা—এভাবনাই সুধাপ্রসন্নকে ঠেকিয়ে দেয়।

শেয়ালদা থেকে সিঁথি আসার কোনো ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। দীপেশ কৌশলে কালীঘাট পর্যন্ত এসে ট্যাক্সিকে আরও একটু এগিয়ে যেতে বলল।

কোথায় যাবেন ? বয়স্ক সর্দারজি ইঞ্জিন না থামিয়ে প্রশ্ন করল।

একটু আগে।

কতটা আগে বাবুজি, টালিগঞ্জ ব্রিজ ?

না, আর একটু আগে, মহাবীরতলা।

দীপেশ ভাবছিল, এই বুঝি তার কাছে একসট্রা পাঁচ টাকা চাইবেন সর্দারজি। এতটা রাস্তা এম্‌পটি ফিরব—এমন যুক্তিতে।

বাস্তবে কিন্তু তেমনটি হলো না। গাড়ি গড়িয়ে যাচ্ছিল মহাবীরতলার দিকে।

ডান দিকে উজ্জ্বলা সিনেমার মাথায় মিঠুন চক্রবর্তী এবং অমিতাভ বচ্চনের বিশাল কাট আউটের গলায় শাদা ফুলের মালা প্রায় পা পর্যন্ত। তাতে মাঝে মাঝে লাল গোলাপ।

ট্যাক্সির কাচের ওপার থেকে বৃষ্টি ভেজা কাট আউটের অমিতাভ বচ্চনের কাঁধে কুমীর।

কয়েক সপ্তাহ আগে উত্তর কলকাতার এক সিনেমা হলের সামনে দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে দীপেশ নতুন রিলিজ হওয়া সিনেমার হিরো-হিরোইনের ছবির গলায় এমনই মাল্যদান পর্ব দেখেছিল। সঙ্গে প্রবল

শিস, হাততালি, 'গুরু' 'গুরু' ধ্বনি। ভিড়ে ভিড় চারপাশ।

আর দাঁড়ানো হয় নি দীপেশের।

মহাবীরতলা অব্দি গাড়ি যাবে। তারপর অটো, নয়তো রিকশা। টালিগঞ্জ ব্রিজের দুপাশে ডুম জ্বেলে আম, তরকারি। সিনেমা হলের শো এখনও ভাঙেনি। ব্রয়লার মুরগীর দোকানটি বন্ধ। ব্রিজের পেটের ওপর ধোঁয়া ওড়ানো লম্ফের আলোয় তরকারি, ফল। নিচে খাল বৃষ্টির জলে কিছু গভীরতা পেয়েছে। আর মহাবীরতলা থেকেই লোডশেডিং-অঞ্চলের শুরু।

জানলার পাশে বসলে ফুরফুরে হাওয়ায় কিছু ঘুম জড়িয়ে আসে। দীপেশ সামান্য নেশায়, হয়ত এই গরমের ক্লান্তিতে বার বার হাই তুলছিল। মহাবীরতলা থেকে আবার গাড়ি বদলাতে হবে। ট্যাক্সি কিছুতেই ভেতরে যাবে না।

আর সে-ও সর্দারজিকে ভেতরে যাওয়ার জন্যে বলেনি। কালীঘাট থেকে মিনি বাসে বড়জোর কুড়ি মিনিট, ট্যাক্সিতে মিনিট পনের। তবুও ট্যাক্সি আরও এগিয়ে যেতে চাইবে না।

অটোতে নয়, রিকশার সিটে নিজেকে বসিয়ে দিতে দিতে দীপেশ ঘড়ি দেখল। প্রায় দশটা। মহাবীর মন্দিরের কাছে অন্ধকারে ঝাঁক-বাঁধা অটো। তাদের চালকদের অনেকেরই মুখ মুছে গেছে। হরিদেবপুর সোদপুর, সিরিটি, মাইতিপাড়া কলাবাগান—এসবই তারা প্যাসেঞ্জার ডাকতে ডাকতে বলে যাচ্ছে। এবং হনুমান মন্দিরের সামনে ধুতি-শার্ট পরা বাঁধানো খাতা হাতে একজন নাতিদীর্ঘ মানুষ বার বার চোখ থেকে চশমা খুলে নামিয়ে, মুছে কোন গাড়ি আগে পরে যাবে, কোথায় যাবে বলে দিচ্ছিলেন। সেখানে অটোঅলা প্যাসেঞ্জারদের কিছু হালকা ভিড়, জটলা।

ছয়

বিছানায় শুয়ে ঘুম নামছিল না সুধাপ্রসন্নর। একটু দূরে আলাদা খাটে ফিকে নাইট ল্যাম্পে নিদ্রাতুর যে রমণী, তাকে নিজের সঙ্গে হাসিতে, জীবনে, আবেগে, অনুরাগে বহুবার আবিষ্কার করেছেন সুধাপ্রসন্ন! জীবনে এমন তো হয়েই থাকে। অথচ ইদানীং বেশ কয়েক বছর শরীর সরে গেলে, অপরাজিতা তো শরীর অনেকদিনই সরিয়ে নিয়েছে, এক সঙ্গে থাকার অভ্যাসে কোনো বাধা পড়ে নি। ঘুম না আসলে বালিশের দিক বদল করে ঘাড়ের নিচে রাখেন। অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপচাপ, একলা শুয়ে থাকলে তাঁর জলতেষ্টা, পেচ্ছাপ পায়। ঘাড়ে মুখে কানে, কনুই বা হাঁটু অব্দি ঠাণ্ডা জল দিয়ে এলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে।

এই বয়েসে এসে কখনও শৈশব কখনও যৌবনকে মনে করে সুধাপ্রসন্ন স্মৃতিতে ডুবে যান। তাঁদের কালীঘাটের বাড়ি, যেখানে আরও দুই ভাই রয়েছে। বাবা ছিলেন হাইকোর্টের ব্যারিস্টার। সঙ্গে কিছু রাজনীতি। বাড়িতে শরৎ বসু, শ্যামাপ্রসাদ, সুভাষচন্দ্র।

ঘুম না এলে স্মৃতি আসে। কৈশোর, বালকবেলা। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে যেখানে বছর দশ আগেও চন্দ্রকুমার স্টোর্স ছিল, সেখানে তখন হাজি কাশিমের বাজার। আটচালা অনেক শেড। মুসলমান দর্জি ছিলেন ওমর খলিফা। তাঁর কাছে বাবা পাঁচ ভাইকে নিয়ে যেতেন জামা-প্যাণ্ট বানাতে। সেটা ১৯৩০-এর আগে। রাসবিহারীর মোড়ে এখন যেখানে দেনা ব্যাঙ্ক, সেখানে বাজার, বাকি অনেকখানি পুকুর—প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড পর্যন্ত। মাঠে 'অর্কেস্ট্রা' শিল্ডের ফুটবল খেলা হতো। পুকুর বুজিয়ে তৈরি হয়েছিল মাঠ।

রাসবিহারীর ওদিকে কেউ ভয়ে যেতে চাইত না। বালিগঞ্জ পর্যন্ত

জঙ্গল, মাঠ, জলা। ১৯২০ নাগাদ—তাঁর একেবারে শৈশবে সেখানে ঠ্যাঙাড়ের বাস ছিল—এমনটি শুনেছেন। সুন্দরবন, সুদূর দক্ষিণ বঙ্গ থেকে আলিপুর কোর্টে মামলা লড়তে আসত সম্পন্ন গৃহস্থ। ঘোড়ার গাড়িতে আসা-যাওয়া বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে। বিকেল বিকেল দল বেঁধে তারা ফিরত ঘোড়ার গাড়িতে। একটু সন্ধে হয়ে গেলে, একলা কোনো ফিরতি পথের মানুষকে পেয়ে ঠ্যাঙাড়েরা তাকে শেষ করত। এমন কি একখানা পরনের ধুতির জন্যেও খুন।

গোটা কালীঘাট জুড়েই তখন পুকুর। মুখার্জি পাড়ায় পুকুর, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রিটে পুকুর, কালীঘাট পার্কের জায়গায় কাশিপুকুর।

ভাবনা থেকে ভাবনায় যেতে যেতে সুধাপ্রসন্ন বালিশের দিক পাল্টালেন। ঘুম আসে না। স্মৃতি আসে। এখন যেখানে চারুর মাঠ, সেখানে পুকুর। বাড়ির ভেতর বেজি, সাপ! শেয়াল ডাকত রাতে। ভাম আসত রান্নাঘরে। আর প্রায়ই মুখে করে নিয়ে যেত পায়রা। তাঁর শখের পায়রা ছিল। ওড়াই এবং ঘরে ঘুরে বেড়ানো। লক্কা, মুক্কি হোমার, চিনি, শাদা, কালপেটিয়া, লালপেটিয়া, পাউটার (গলাফুলো) —আরও কতকি! সব নাম কি এতদিন পর ধরে রাখা যায়!

সে সময় রোজই প্রায় সাপ বেরোয় কালীঘাটের বাড়িতে, বিছে। বাবা খুব ভালো সাপ মারতেন লাঠি দিয়ে।

কবুতর-হননকারী ভামটিকে মারা হলো লাঠি পিটিয়ে। সে যেন এক যুদ্ধই। সারা রাত জেগে নিশাচর প্রাণীটিকে বধ করার স্মৃতি। মার লাঠি মার লাঠি। এক সঙ্গে বাবা তিনি আর ছোট ভাই।

গোটা বাড়ি জুড়ে হৈ-চৈ। আলো। চিৎকার। উত্তেজনা। শরীরের সঙ্গে ল্যাপটানো কানে বিপদের মোকাবিলা বা পাল্টা ঝাঁপিয়ে পড়া নয়। বরং পালানো, প্রাণ বাঁচানোর প্রস্তুতি। আর পায়রাদের ভয় পাওয়া ডানা ঝাপটানোর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এখনও কানে বিঁধে আছে।

সেই পায়রার পালক, লোম, রক্ত, ভামের আসা-যাওয়া, লাঠি দিয়ে ল্যাজসমেত প্রায় তিন হাত ভামটি পিটিয়ে মারার স্মৃতি এখনও

সুধাপ্রসন্নর মস্তিষ্কের খোপে। ভামের মৃত দু চোখের নিচে শাদা ছোপ, প্রায় থেঁতলে যাওয়া মাথা, কষের পাশে গড়িয়ে পড়া ফেনায়। হে মৃত্যু, হে মৃত্যু।

আশেপাশে সবুজ ছিল অনেক। ঝাড়ালো সব গাছ। অন্ধকারে তার ডাল বোঝাই জোনাকির মিটি মিটি আলো। বাতাসের ধোঁয়ায় বিষে সেইসব জোনাকিরা যে কোথায় গেল! কত পাখি ছিল কালীঘাটের বাড়ির আশেপাশে। এখন শুধু কাক কি চড়াই, নয়তো শালিক। বাড়ির খাঁচায় বন্দী টিয়া-চন্দনা, কোকিল। কখনও বদরি বা চুনিয়া-মুনিয়া। উড়ে আসা পাখির মধ্যে বড়জোর কোনো ফাজিল দোয়েল, হয়তো অ্যানটেনার দোলায়, শিস দিতে দিতে।

কালীঘাটের বাড়িতে এক আধ রাত থাকলে বদলে যাওয়া চারপাশ বড় বেশি করে নজরে পড়ে সুধাপ্রসন্নর। হাজি কাশিমের বাড়ির ওপর এখন দেশবন্ধু স্কুল। লেডিজ ওন এখন যেখানে, সেখান থেকে পুরো লম্বা চত্বরটা মসজিদ ছিল। পাশে প্রিন্স গোলাম মহম্মদের বাড়ি আর বাগান।

এখন কালীঘাটের মন্দির চত্বরে যেখানে মোটর গাড়ি, ট্যাক্সি দাঁড়ায়, সেখানে ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেণ্ড ক্লাস দু'রকম ঘোড়ার গাড়িই থাকত। কোনো বিশেষ উৎসব থাকলে, যোগ-যাগের ব্যাপার হলে, তাঁদের বাড়ির সামনের মাঠে মন্দিরে আসা ঝকঝকে ল্যাণ্ডো ব্রুহাম ব্রাউনবেরি আর তাদের বলিষ্ঠ ওয়েলার ঘোড়া দাপট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। দুধঅলা পার্কে বিক্রি হতো ঘোড়ার ঘাস।

রাতে অনেকক্ষণ ঘুম না এলে, দু চোখে, শরীরে কি এক অবসাদ জড়িয়ে আসে। তবু স্মৃতি থেকে একলা স্মৃতিতে ফিরে যেতে ভালোই লাগে সুধাপ্রসন্নর। এ যেন কোনো ক্যালিডোস্কোপ চোখে লাগিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে অতীত দেখার মজা।

এই রাতে, নির্জনতায়, অতীতচারী সুধাপ্রসন্নর মনে পড়ল কালীঘাট থেকে কতদিন অক্লেশে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছেন শ্যামবাজারে সিনেমা দেখতে। দল বেঁধে যাওয়া। পথের খাদ্য

বলতে এক পয়সার কড়াইশুঁটি, যদুবাবুর বাজার থেকে কেনা কলকাতার রাস্তায় তখন জৈৎকা কোম্পানির বাস। হাওড়ার পুল, পনটুন ব্রিজ—খুলে নেয়া যায়। শ্রী আর উত্তরার নাম তখন কর্নওয়ালিশ আর কোরিন্থন। সিনেমায় ফোর্থ ক্লাস টিকিটের দাম চার আনা। ছ'পয়সায় ট্রামের ট্রান্সফারেবল টিকিট। ১৯২৭-২৮—এই বোধহয় লেক কাটা শুরু হলো। সেই লেকে যাওয়ার পথে বিপিনচন্দ্র পালের ছেলে নিরঞ্জন পালের শেড। পাঁচিল ঘেরা। মাথায় ছাদ নেই। সিগারেটের রাংতা মারা বোর্ড দিয়ে রিফ্লেকটারে সিনেমার শুাটিং।

তখন ভবানীপুরে পূর্ণ থিয়েটারের কাছে চড়কডাঙার মোড়। ডাক্তার নলিনী সেনের বাড়ি পর্যন্ত পোড়া বাজার। সার্কাস পার্টি যতবার আসত সেখানে, প্রায়ই আগুন লাগত। সেই থেকেই নাম পোড়াবাজার। ওর কাছাকাছিই শিল্পী ও. সি. গাঙ্গুলীর বাড়ি।

সে সময় এক গ্যালন পেট্রলের দাম ছ'আনা। কালীঘাট থেকে ট্যাক্সিতে চিড়িয়াখানা যাওয়ার খরচ ছ'আনা—মিটারে উঠত। আসা-যাওয়া বারো আনা।

১৯৩৩-৩৪-এ একটা ক্লাইড ফ্যান কিনেছিলেন বাবা। সেই ফ্যান আজও আছে কালীঘাটের বাড়িতে। সারা বাড়িতে তখন পাখা বলতে ঐ একখানিই। তা ঐ বাবার চেম্বারে, মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলার জায়গায়। তাঁর বিয়ের পর, চল্লিশ সালে একটি অসলার পাখা এনে দিয়েছিলেন বাবা অপরাজিতার জন্যে।

এখনও স্মৃতি ফেরাতে ফেরাতে দেখতে পান ভবানীপুর থানার বাড়ি, আশুতোষ কলেজ, গুরুদ্বার তৈরি হচ্ছে। এই তো সেদিনের ঘটনা মনে হয় সব।

গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে যাচ্ছেন বাবা। সঙ্গে নিজের পেরিস্কোপ। মোহনবাগানের খেলা থাকলে বাবার কোর্ট নেই। মাঠে যাবেনই। মোহনবাগান মানেই তখন অ্যান্টি বৃটিশ, অ্যান্টি ইমপেরিয়ালিজম। হেঁটে পৌঁছে যাওয়া যেত গড়ের মাঠ। বাড়িতে

একতলায় থাকতেন বড়দি-জামাইবাবু, জামাইবাবুর মা, ভাগ্নে-ভাগ্নীরা। জামাইবাবুর কোনো বাঁধা চাকরি নেই। যখন যেটা পারেন করেন। কেমন যেন ট্রু সেন্স বোহেমিয়ান। না বলে চলে যান কোথায় কোথায়। কখনও সাধু খুঁজতে। কখনও দেশ দেখতে। একবার তো দেড় বছর পর ফিরলেন কাশী থেকে। সেখানে কাকচরিত্র, ভৃগু পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা—এই সব শিখছিলেন গুরুর কাছে। শেষ অব্দি অবশ্য আদৌ কতটা শেখা হয়েছিল, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই গেছিল।

মোহনবাগানের খেলা হলেই জামাইবাবু সুধাপ্রসন্নকে বলতেন. বড়বাবু চলো মাঠে, আজ মোহনবাগানের-খেলা।

মাঠের থেকে একটু দূরে রাখা ঠেলাগাড়িতে উঠে খেলা দেখাত লাগত চার আনা। ড্রাম নিয়ে আসত অবাঙালিরা। তার ওপর লোক দাঁড় করিয়ে পয়সা নিত। সে সময় ক্যালকাটা মোহনবাগান খেলা মানে রীতিমতো ভিড়। মাঠে লোকে-লোকারণ্য। জাতীয়তাবাদ বনাম বিদেশী শাসক।

ঘুমের মাঝে কিছু একটা অস্ফুটে বলে ওঠা অনেকদিনের অভ্যাস অপরাজিতার। আজও তিনি কি যেন বললেন। সুধাপ্রসন্ন বুঝতে পারলেন না। ফিকে অন্ধকারে দেখতে পেলেন অন্য খাটে পাশ ফিরে কোলবালিশ ধরে নিতে নিতে অপরাজিতা আরও কুঁজো হলেন। পেটের ভেতর কোলবালিশ।

সেই ভিড়ে-ভিড়াক্কার মোহনবাগান-ক্যালকাটা ফুটবলে কাদায় পা রাখতে পারছে না মানুষ। তার মধ্যে মাউনটেড গোরা পুলিশের তাড়া। তাঁদের পাড়ার ভুঁদি গয়লা সেদিন মাঠে খেলা দেখতে গেছিল। তার ওপর গড়িয়ে গেল মাউনটেড পুলিশের আক্রমণ। লোক সরানোর জন্যে। ভুঁদি পড়ে গিয়ে কাদা মাখামাখি।

পুলিশ সরে গেলে জামাইবাবু ওকে বললেন, কিরে তুই পড়ে মার খেলি! মায়ের দুধ খাস নি!

জামাইবাবুর কথায় যেন ম্যাজিক ছিল, এবং সুধাপ্রসন্নর মনে

পড়ল, ভুঁদি তার মালকোঁচা মারা ধুতি আর গেঞ্জি পরা কাদামাখা শরীর নিয়ে যেন বা পুরাণ-প্রতিম কোনো নায়কের মতো উঠে, আপনারা সঙ্গে আছেন তো বাবু বলে, সেই পুনরায় ধেয়ে আসা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পুলিশটিকে আক্রমণ করে—যেন বা জাতীয়তার উত্তাপে এবং আক্রোশে, সাহেব মারার আনন্দে।

নিয়মিত কুস্তি লড়া পালোয়ান চেহারার ভুঁদি আক্রমণে আক্রমণে ক্রাউনটি হারিয়ে দিতে পারে পুলিশটির।

এবং ঘোড়া থেকে পেড়ে ফেলে তার চোখে মুখে ইউনিফর্মে ক্রমাগত কাদা এবং ঘুষি ছুঁড়ে যেতে পারে। যেহেতু ক্রাউন হারায়, তাই পুলিশটিকে বেশ ঘা-কতক মারার পর দৌড়ে পালানো ভুঁদিকে নিজের ঘোড়াটিকে খুঁজে, বাগে এনে পিঠে উঠে অনেকটা পথ চেজ করে ধরে ফেললেও সে তেমন কিছু করতে পারে না, কারণ তার ক্রাউন হারিয়েছে। এ ব্যাপারে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে উর্ধ্বতন সার্জেন্টের কাছে। মনুমেন্টের কাছে ভবানীপুর মাঠের একটু আগে ধরা পড়েছিল ভুঁদি। সেই ঐতিহাসিক দৌড় এখনও মনে আসে।

১৯২৯ এখন থেকে কত বছর আগে! নাকি ১৯৩০? চক্রবেড়িয়া রোডের ওপর শখের থিয়েটার করার জন্যে প্যাণ্ডোরা ক্লাব। হকার্স কর্নারের গায়ে রাস্তার ওপর বাড়িতে ক্লাবের নিয়মিত থিয়েটারের রিহার্সাল। সুধাপ্রসন্ন তখন সাউথ সুবারবান স্কুলের ছাত্র। স্কুল ছুটির পর জানলা দিয়ে প্যাণ্ডোরা ক্লাবের রিহার্সাল দেখা। সে এক মস্ত আকর্ষণ। পাবলিক স্টেজ অ্যাকটর ব্যাচা সিংগী, সনৎ রায়চৌধুরীর অভিনয় দেখার জন্যে সারাদিনের প্রতীক্ষা। যেন বা কোনো স্বপ্নের রাজকুমার এঁরা। থিয়েটার ক্লাবের মোশান মাস্টার ছিলেন হরিবাবু। ছ'ফিটের ওপর লম্বা। ব্যাচেলার মানুষ। দিনরাত নাটক-যাত্রা নিয়েই থাকেন। কাপ্তেন চেহারার হরিবাবুকে সব সময়েই দেখা যেত প্যাণ্ডোরা ক্লাবের রিহার্সালে।

লাহোর জেলে তেষট্টি দিন অনশন করে শহিদ হলেন যতীন দাস। সারা দেশ জুড়ে আলোড়ন। যতীন দাসের ডেড বডি আসবে লাহোর

থেকে কলকাতায়।

যতীন দাস শহিদ হওয়ার খবর আসার পর এই ক্লাবের মেম্বারদের মধ্যে ফাটাফাটি তর্ক। ক্লাবের নাম 'প্যাণ্ডোরা' থাকবে, না 'যতীন দাস স্মৃতি মন্দির' হবে? তর্ক তর্ক তর্ক।

যাওয়া হলো হরিবাবুর কাছে। হরিবাবু বললেন, থিয়েটার ক্লাবই থাক।

কিন্তু সে কথা মানা হলো না। বেশির ভাগ মানুষই চাইলেন 'যতীন দাস স্মৃতি মন্দির' নাম হোক।

সুভাষচন্দ্র বসুকে সভাপতি আর সত্য বক্সিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করে তৈরি হলো কমিটি। এ সব শেষ হতে হতে রাত আটটা। সেটা বোধহয় সেপ্টেম্বর মাস।

ঠিক হলো, পরদিন সকালে চক্রবেড়িয়া থেকে হেঁটে যাওয়া হবে জোড়াসাঁকো। রবীন্দ্রনাথের কাছে। এবং রবীন্দ্রনাথ নামেই কি এক আকর্ষণে, রোমাঞ্চে, কৌতূহলে সুধাপ্রসন্ন মিশেছিলেন পরদিনের পদযাত্রায়। সামনে সুভাষচন্দ্র, সত্য বক্সি। মানুষ চলেছে হেঁটে হেঁটে। মানুষ আর মানুষ। তারা চক্রবেড়িয়া থেকে হাঁটতে হাঁটতে জোড়াসাঁকো যাবে। আকাশে হয়ত জমাট মেঘ ছিল। কখনও কি মেঘ ভাঙা রোদও? আর গুমোট, চলার ছন্দে, পরিশ্রমে শরীর ঘামছিল—কিন্তু উত্তেজনায় ঢেকে যাচ্ছিল সব কিছু।

রবীন্দ্রনাথ বোধহয় ভেতরে লিখছিলেন। সুভাষচন্দ্র ঢুকে গেলেন। পাশাপাশি আরও দু'একজন। কবি কি বাইরে এলেন? এই সত্তর পেরনোর পর স্মৃতি বড় প্রতারণা করে। শেষের ঘটনা আরও পিছিয়ে যায়। আগের কথা মনে হয় কত পুরনো। এমন কি ইদানীং কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে দু'একদিন থাকলে, ভাইপোদের নাম, তাদের ছেলে-মেয়েদের নামও সব সময় ঠিক ঠিক মনে পড়ে না সুধাপ্রসন্নর। উল্টোপাল্টা ডেকে বিভ্রাটে পড়েন। এলোমেলো হয়ে যায় ব্যাপারটা। অনেকক্ষণ 'এই যে এ' বা 'এই শুনে যা' বলে চালিয়ে তারপর নাম মনে পড়লে বিস্মরণের লজ্জা আসে ঘিরে।

তবু যেন মনে পড়ে সেই উজ্জ্বল চেহারার কবি বিষাদে ডুবে বাইরে এসেছিলেন। তাঁর পৃথিবীর আয়না যেন বা, এমন চোখে হয়ত জল ছিল।

শোকস্তব্ধ মূক মিছিলের সামনে তিনি এসে দাঁড়ালেন। কি যেন দেখলেন অজস্র মৌন মুখগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। তারপর ধীরে মাথা নিচু করে চলে গেলেন সেই বাড়ির গভীরে।

সেদিনই তিনি লিখেছিলেন—'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় ওরে ভয় নাই / নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই!' নাকি এইলাইনগুলি আরও পরে, কিংবা আগে লেখা হয়েছিল? এটুকু সুধাপ্রসন্নকে সংশয়ে ফেলে।

আজকাল কেন যেন এমন হয়, এমনকি খবরের কাগজে পড়া কোনো অতীত ঘটনা বা শোনা কাহিনীকেও মনে হয় বুঝিবা আমি ছিলাম, সেই সময়ে।

রাতে এই ধারাবাহিক অনিদ্রায় আলস্য থাকে, বিষাদ থাকে, থেকে যায় যন্ত্রণা। নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরিয়ে এনে আবারও বালিশ পাল্টাতে পাল্টাতে তাঁর মনে হয় ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের পর বৃটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া যুব বিদ্রোহীদের মামলার ব্রিফ নিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। তার আগে তিনি কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী ইংরেজের আদালত বয়কট করেছিলেন। এ নিয়ে তখনকার স্টেটসম্যান বিদ্রূপ করেতেও ছাড়ে নি।

চট্টগ্রামে মামলা করতে গিয়ে বন্দী অনন্তলাল সিংহের সঙ্গে দেখা করে তিনি বলেছিলেন, বৃটিশের জেল ভেঙে তোমরা বেরিয়ে এসো। কত টাকা লাগবে?

পাঁচশো টাকা চেয়েছিলেন অনন্তলাল। শরৎবাবু কলকাতা থেকে দু'হাজার টাকা আর চারটি টি.এন.টি যুক্ত হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিয়ে গেলেন চট্টগ্রাম। তারপর সেই টাকা এবং বোমা পৌঁছেছিল বিপ্লবী সূর্য সেনের হাতে, স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে।

যে কোনো সময় বৃটিশ পুলিশের হাতে তিনি ধরা পড়তে পারতেন

তাছাড়া ঐ রকমই একটি টি. এন. টি-অলা দেশী হাতবোমায় টেগার্টকে মারতে গিয়ে সামান্য ভুলের জন্যে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছিলেন বিপ্লবী অনুজা সেন। এত সব বিপদ জেনেও শরৎবাবু বোমা নিয়ে গেছিলেন কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে। এ সব ইদানীং প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর শতবর্ষ উপলক্ষে। আর মানুষ শরৎ বসু তো এখনও স্মৃতির ছবি হয়ে সামনে। চেহারায়, বক্তৃতায়। বাবার কাছে আসা-যাওয়ার মুহূর্ত-গুলির মধ্যে।

শরৎবাবুকে নিয়ে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয় সব কাগজে! তাঁর বিপ্লবী জীবনের নানান স্মৃতি আরও একবার তুলে নিয়ে আসা পাঠকের সামনে। যদি মনে পড়ে যায়। বিস্মৃতি যায় মুছে। তাহলে স্মৃতি ফেরানোর মধ্যে এক ধরনের বেদনা যেমন, তেমনি হয়ত আনন্দও। তাই স্মৃতি থেকে স্মৃতিতে যেতে যেতে হাওয়ায় ফুলে ওঠা মশারির দিকে তাকিয়ে নিদ্রাহীন সময় পার করতে করতে সুধাপ্রসন্ন যখন ভাবছিলেন একবার ঘাড়ে-মুখে জল দিয়ে আসবেন কিনা, যেন বা তখনই অপরাজিতা তাঁর ঘুমের মধ্যে বলা অস্ফুট কথা কিছু চেঁচিয়ে বলতে বলতে হঠাৎ দুর্বোধ্য চিৎকারে চলে গেলেন। সে চিৎকার ভয়মাখা।

নাইটল্যাম্পের আলোয় চিৎ হয়ে বুকের ওপর দুটি হাত দিয়ে শোয়া অপরাজিতাকে 'বোবা'-য় পেয়েছে এমন জেনেও সুধাপ্রসন্ন তখনই ওঠেন না। কারণ এমন ঘটনা তো তাঁর বহুদিনের অভ্যাসে। আরও একবার অব্যক্ত স্বরে গোঙানি বেরিয়ে আসার পর তিনি উঠে পাশের খাটের সামনে আসেন। অপরাজিতাকে মৃদু ঠেলা দেন। একটি দুটি তিনটি। ঠেলাতে সম্বিত ফেরে। ধাতস্থ অপরাজিতা আঁা—কি, বলতে বলতে কিছু অস্বস্তিতে, হয়ত লজ্জায় চেতনে ফেরেন। স্বপ্নে, ঘুমে হয়ত কোনো দুর্ঘটনা তাঁকে তাড়া করেছিল। কিংবা কোনো প্রিয় বিষাদ-মুহূর্ত। আপাতত সেই জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে অপরাজিতা প্রথমে পাশ ফিরে শোন। তারপর মশারির ভেতর কিছুক্ষণ উবু হয়ে বসে শরীরকে বশে এনে ধীরে ধীরে মশারির দেয়ালে

তরঙ্গ তুলে বাইরে আসেন। তিনি জল খাবেন। বাথরুমে যাবেন।

এই বোবায় ধরার চিৎকারে নিজের স্টাডিতে আলো জ্বেলে পড়তে থাকা সতীপ্রসন্ন কি যেন এক সূক্ষ্ম টানেই বই মুড়ে বাইরে আসেন। তিনি সেই রমণীকে শ্লথ পায়ে, শিথিল বসনে, বারান্দা পেরিয়ে উঠোনে চলে যেতে দেখেন। একদা, বয়েসে, যে নারী তাঁকে উষ্ণ-প্রণয় দিয়েছে, জীবনের বহু ফাঁক ভরাট করে দিয়েছে, সেই শরীরটিকে দেখে কেন জানি না আজ তাঁর আবারও মায়া জাগে।

দীপেশ কিছু ঘুম, কিছুবা জাগরণেই ছিল। স্কচ, টেলিসিরিয়ালের মিউজিক, অর্থ-প্রতিপত্তি-সম্মান নানান নেশার মাত্রা হয়ে ক্রিয়া করছিল তার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে।

শব্দে জেগে উঠে কি হয়েছে এমনটি ভেবে ধাতস্থ হতেই দীপেশের কিছু সময় গেল। তারপর দরজা ভুলে গিয়ে কিছু ভুল জায়গায় হাতড়ে, দেয়ালে এবং খাটে বার দুই তিন ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে আলো জ্বেলে ঢাকা বারান্দায় দুই জ্যাঠামশাইকে একই নারীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে কৌতূহলে, কি হয়েছে, এত রাতে চিৎকার—এবং ব্যাপারটি জানার পর, নিশ্চিন্ত হয়ে কিছুটা বিরক্তিতেই —তোমরা সব পারোও বলে, নিজের ঘরে ফিরে ফিকে নেশায় দীপেশের মনে হলো ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল দিয়ে যদি সিরিয়ালের টাইটেল মিউজিকটা করা হয়, তার সঙ্গে বাঁশীর সূক্ষ্ম ব্যবহার, মনে হয় জমে যেতে পারে।

ক্যাসেট প্লেয়ারে নিজের প্রিয় হাঙ্গেরিয়ান ফোক সংয়ের ক্যাসেট ঢুকিয়ে বোতাম টিপে দিল দীপেশ। টাইটেল মিউজিকে ওয়েস্টান ফোক কি চলে? বিশেষ করে রবীন্দ্র-গল্পে? এমন ভাবনায় মশারির ভেতর ফিরে গিয়ে তার মনে পড়ল লাইট নেভানো হয় নি। সুতরাং বাইরে বেরিয়ে আবার লাইট নিভিয়ে এসে দীপেশ দোলনের ফিল্মি ভাবনাকে সঙ্গীত সুরভিত করার জন্যেই বুঝি ফোক মিউজিকে ধীরে ডুবতে লাগল।

বাথরুম ফেরত অপরাজিতা চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপে সতীপ্রসন্নকে

দেখে নিয়ে ধীর গলায় বললেন, রাত হয়েছে। শুয়ে পড়। তারপর নিজের ঘরে যাওয়ার আগে অপেক্ষমান সুধাপ্রসন্নকে দেখে সুইচগুলো একবার নেভানো হয়েছে কি না দেখে নিও বলে শয্যাগামিনী হলেন।

বারান্দার দরজায় খিল দিয়ে লাইট নিভিয়ে নিজের ঘরে যাওয়ার আগে সুধাপ্রসন্ন দেখতে পেলেন সতীপ্রসন্নর স্টাডিতে আলো, খোলা, জানলা দিয়ে তার চৌকো রেখা দেখা যায়। দীপেশের দরজা খোলা। সেখান থেকে কিছুটা আলো অন্ধকার বারান্দায় গড়িয়ে পড়েছে।

সাত

আজ অনেক সকালে হাঁটতে হাঁটতে করুণাময়ী বাজারের দিকে গেছিলেন সতীপ্রসন্ন। পথে ফুল ঝরে যাওয়া রাধাচূড়া, আর পায়ে থেঁতলে যাওয়া নিমফল দেখতে পেলেন। যেন বা পাথর, এমন সব ফলেরা রাস্তায়, চলার পথে। মুখ থুবড়ে। কখনও ছোট, লাল বিষ পিঁপড়ে সেই ফলের গায়ে।

সুকান্তপল্লী বাস স্টপের ডান দিকে ঝাড়ালো বটগাছ, চা-কচুরি-ঘুগনি-পাঁউরুটির দোকান, পান সিগারেটের দোকানের একটু আগে যে শাখাবনত ফলবতী জামগাছ, তারও কিছু ফল রাস্তায়—পায়ে পায়ে চটকে গেছে। কালচে রং মিশেছে কাদা রঙের সঙ্গে। মানুষ ক্রমশ বাড়ছে, সরে আসছে মূল শহর থেকে—এই শহরের শাখা-প্রশাখায়। তাই গাছ, ছায়া, পাখি, সবুজ ক্রমশ যেন আরও দূর-গামী।

হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ল তখনও করুণাময়ী, হরিদেবপুর মিনি, চল্লিশ, চল্লিশের-এ, একুশ চালু হয় নি। চোদ্দ নম্বরে চণ্ডীতলায় নেমে দু'পাশের ধান কল পেরিয়ে হেঁটে বাড়ি আসা, কলেজ স্ট্রিট ফেরত। সেইসব ধানকলেরা নিরুদ্দেশ। তাদের ছাই দিয়ে ভরাট নিচু জমির ওপর এখন আলো জ্বালানো বাহারি ঘর-বাড়ি, মানুষের বসতি। কেবল তার 'খণ্ডহর'-স্মৃতি কোথাও কোথাও চিমনিতে, ভাঙা বাতিল,

জং ধরা লোহায়। রাতে তাদের অবয়বে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মায়া।

পায়ের নিচে সেই পাথরপ্রতিম, শুধুই রঙে, নিমফল থেঁতলে গেল। যে রাস্তায় শর্টকাটে করুণাময়ীর বাজারে যান, সেখানেও তখন ইট ভাটা। ইদানীং বেশ কয়েকবছর ইট তৈরি হয় না। মাটি কেটে নিতে নিতে প্রায় পুকুর হয়ে যাওয়া নিচু জমি, বর্ষায় জলে সহজেই তা জলাশয় হয়ে ওঠে। এবং শীত গ্রীষ্মে বা অন্য সময়ে গোরু-ছাগল চরার জায়গা। বুনো ঘাস, ভেরেণ্ডা, চুরচুরি পাতা, বুনো ফুল।

এ জমিও ভর্তি হয়ে বিক্রি হয়ে যাবে। এখনই আঠারো/কুড়ি হাজার টাকা কাঠা। দাম আরও বাড়বে।

একটি গাছ মানুষকে পঞ্চাশ বছরে যত অক্সিজেন দিয়ে যায়, এখনকার হিসেবে তার দাম পনের হাজার সাতশো টাকা। গাছ তো আরও কত কি দেয় মানুষকে—ছায়া, সবুজ, বৃষ্টি, কাব্য। এমনকি জীবনদায়ী ওষুধও। পঞ্চাশ বছরে একটি বৃক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি সম্পদ দেয় মানুষকে। মানুষ লোভে, মূর্খ-স্বপ্নে সেই অরণ্য নষ্ট করে। 'ক্যালকাটা : মাই লাভ' আন্দোলন কি ইউরোপের গ্রিনসদের কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে? যারা পরিবেশ-সংরক্ষণকে রাজনৈতিক স্তরে নিয়ে এসেছে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। নাকি শুধুই আবেগে, সেমিনারে, খবরের কাগজে ছাপা নাম, ছবিতে, দূরদর্শনের পর্দায়, কিছু অলীক প্রতিশ্রুতির ফাঁদে হারিয়ে যাবে?

কলকাতার পুরনো, ঐতিহাসিক বাড়ি ভেঙে ভেঙে মাল্টিস্টোরিড, এমন কি কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসের মালিকানাও নাকি কর্মীদের বদলে কোনো ব্যক্তি-সংস্থার হাতে তুলে দেয়া হবে—তার প্রচেষ্টা চলছে ভেতরে ভেতরে! সব বিক্রি হয়ে যাবে, সমস্ত সবুজ, যাবতীয় ইট-কাঠ-পাথরের ইতিহাস? ট্র্যাডিশান, স্মৃতি মুছে দিয়ে হৃদয়হীন এ কোন আধুনিকতার দিকে যাত্রা? পৃথিবীর কোন দেশে এমন হয়?

আকাশে তেমন মেঘ নেই, কিন্তু আলো কম। ভোরের বৃষ্টিতে পৃথিবী জুড়িয়ে আছে। করুণাময়ীর বাজার এখনও বসার সময় হয় নি। গতকাল বাজার করে রেখেছেন। ফ্রিজে তার অতিরিক্ত

ভাণ্ডারটুকু জমা আছে। নিশ্চিন্ত। আর তখনই তাঁকে চমকে দিয়ে খানিকটা কাদা-জল ছিটিয়ে কাপড় নোংরা করে কান ফাটানো হর্ন দিতে দিতে যে ট্যাক্সিটি চলে গেল, তার নাম্বারটুকুও ঘুরে, ভালো করে পড়তে পারলেন না সতীপ্রসন্ন। অজস্র মবিল-ডিজেল, নাকি পেট্রোল পোড়া ধোঁয়ায় তাঁর নাক-চোখ, ভেতর-বার জ্বলে উঠল, পাশ পকেট থেকে রুমাল এনে নাক ঢাকা দেয়ার আগে। গোটা অস্তিত্ব নড়ে গেল দূষণে। একসঙ্গে কতগুলো সিগারেটের ধোঁয়া ইনহেল করলেন সতীপ্রসন্ন এই একবারের ধোঁয়াবাজীতে? চট করে হিসেবটা মনে পড়ল না। শুধু এ অপরাধেই কলকাতার অর্ধেক গাড়ি বাতিল করা উচিত। আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দের দূষণে এ শহরের চল্লিশ শতাংশ মানুষ হয় পুরো কালা নয়তো অর্ধ-বধির হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর কাছে এ হিসেব আছে। আসলে একটি কাগজ করতে হলে কত কি যে জানতে হয়! কত লাইব্রেরি ওয়ার্ক, ডাটা। এবং ইদানীং পাঠককে কভার স্টোরি নামক ধোঁকায় ফেলার জন্যে (ধোঁকা ছাড়া আর কি-ই বলতে পারেন সতীপ্রসন্ন! সেভাবে তো আজও ডাটা স্ট্যাটিসটিকস ব্যাঙ্ক তৈরি হলো না এদেশে।) এ সবের জন্যে যার আরও বেশি বেশি প্রয়োজন। তাই শেষ পর্যন্ত বড় কাগজের থেকে তথ্য নিয়ে নিয়ে নিজের মতো করে লিখে প্রচ্ছদ-কাহিনীর ধাপ্পা তৈরি করা শুধু।

কলকাতার সবুজ খেয়ে নিচ্ছে পাতাল রেল, চক্ররেল, দ্বিতীয় হুগলী সেতু। ময়দান, পার্কের বেশ খানিকটা করে জমি হাত ছাড়া হয়ে গেছে। আসলে নগর বসাতে গেলে, মানুষ বাড়লে এসব তো হবেই। কিন্তু ঘিঞ্জি পরিবেশকে দূর করার কথাও ভাবাতে হবে। নাহলে মস্কো, পিকিং, পশ্চিমী দেশের যে কোনো বড় শহরে কেন এত সবুজের আয়োজন? গাছ আর গাছ।

সতীপ্রসন্ন কাগজে পড়েছেন বহুবার আকাশ থেকে, প্লেনের সিটে বসে পিকিং—নাকি এখনকার বেজিং অথবা পেইচিংকে মনে হয় কোনো সবুজ বনভূমি। এ গাছই তো বৃষ্টি ডেকে আনে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য

রেখে ভূমির ক্ষয় রোধ করে।

বীরেন রায় রোড ধরে সোজা সিরিটি মোড়ে এসে ডান দিকে ঘুরে করুণাময়ী যাওয়ার সাবেক পথটি সামনে ভেসে উঠল সতীপ্রসন্নর। সময় কম লাগত বাজারে আসতে। তখনও রাস্তার বুক কেটে পাতালের মাটি তুলে আনা শুরু হয় নি।

বাঁ পাশে টালির নালা। ঢালু জমির গায়ে বুনো ঝোপ। ওপারে টালির চাল, বাঁশ-মাটির দেয়ালের বসতি। অজস্র শকুন বসে থাকে এপারে ওপারে, মৃতমাংসের আশায়। ডান দিকে বিড়ি-সিগারেটের দোকান, জুতো সারানোর ছাউনি, একটি খালি পাকা বাড়ি, ফাঁকা মাঠ, বন্ধ কারখানা। উল্টো দিকে জবর-দখল ঝুপড়ি বস্তি। যা কিনা নিয়মিত চোলাই মদের বিশ্বস্ত ঠেক। আর তারই সামনে প্রায় একতলা সমান কাঠের রথ। প্রতি বছর রথযাত্রার দিনটিতে রং করা রঙিন রথ জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা নিয়ে পিচকল পেরিয়ে সুকান্ত পল্লীর মোড়ে বটতলায় থামে। সেখানে সাতদিন থেকে আবার ফিরে আসে উল্টোরথের টানে। সারা বছর ঝড় বৃষ্টি রোদে রথের কাঠামোটি কিন্তু অবিচল থাকে ঐ বস্তির সামনে। এবং এখনও এই মাটি কাটার সমারোহেও তা স্থির, অনড়। শুধু চোলাইয়ের ঝুপড়িগুলি কিছু এদিক-ওদিক হয়ে গেছে। যদিও কিছুদিন আগে উৎসব গেছে, কিন্তু রথের চেহারায় তেমন জেল্লা নেই।

মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে অরিনের সঙ্গে বসবেন সামনের তিনটি সংখ্যার কভার স্টোরি নিয়ে। দেশপ্রিয় পার্কের কাছ থেকে দুটি বাস বদলে অরিন তাঁর বাড়ি আসবে। বাড়ির পথে নতুন হাঁটা অভ্যাস করা রাস্তায় ফিরে যেতে যেতে পুরনো চলা পথের মানচিত্রটি হঠাৎ মনে পড়ল সতীপ্রসন্নের, এমন তো অনেক সময়েই হয়।

ভোরের রুটিনমাফিক হাঁটাটি সেরে বাড়ি ফিরে মুড়ি আর নারকেল-কোরা খাচ্ছিলেন সতীপ্রসন্ন। সঙ্গে সামান্য চিনি। বাড়ির উঠোনে এখনও দুটো গাছ। বছরের নারকেল কিনতে হয় না। এবং তাঁদের দুই ভাইয়ের গোচরে—তাঁদের ভাবখানা থাকে যেন কিছুই

জানি না, মনোরমা আর অপরাজিতা নারকেল পাতা থেকে বের করা ঝাঁটার শলা, ঝুনো নারকেল বিক্রি করে পয়সা সমান ভাবে ভাগাভাগি করে নেন। চার-পাঁচ টাকার কমে এখন একটা ঝুনো নারকেল পাওয়া যায় না। বিজয়া, লক্ষ্মীপুজো, অম্বুবাচী, পৌষ সংক্রান্তির সময় দাম আরও বাড়ে। হিসেব করে, সময় মেপে মেপে বাজারে নারকেল ছাড়েন দুই বোন—দুই জা। বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার লোক আছে। এই তো ক'দিন আগে সহদেব এসে গাছ ঝুরিয়ে দিয়ে গেল—পুরনো পাতা কেটে গাছ পরিষ্কার করে, কাকের বাসা ভেঙে। এসব মনোরমা আর অপরাজিতার দায়িত্ব।

মুড়ি-নারকেল খেতে খেতে জুন সংখ্যার পরিবেশ সংক্রান্ত কভার স্টোরিতে নিজেই ফিরে যাচ্ছিলেন সতীপ্রসন্ন। বাড়িতে রাখা ফাইল-বন্দী সংখ্যা ওল্টাচ্ছিলেন। 'পরিবেশ'-এর যে সংখ্যাটি পুরোপুরি বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে মনে রেখে। খুব ভালো ভালো তথ্য দিয়ে মলাট-কাহিনী সাজিয়েছিল অরিন। এর পরে আরও দু-একটি কাগজের এই ধরনের লেখায় অরিনের স্টোরিকে সূত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটুকুই তো 'পরিবেশ'-এর গর্ব। তাঁর পাওয়া। এরসঙ্গে একটু ভালো ছবি দিতে পারলে—ব্যর্থতার শ্বাস দীর্ঘ হয়, সতীপ্রসন্ন সেটি কষ্ট করেই চাপলেন।

কলকাতায় যে হারে মানুষ বেড়েছে, সেই হিসেবে খোলা জায়গা, পার্ক বাড়ে নি। যে কোনো আধুনিক শহরে মাথাপিছু খোলা জমি থাকার হিসেব দুশো পঞ্চাশ বর্গফুট। লণ্ডন আর বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে বিষয়টি মানা হয় কঠোর ভাবে।

কলকাতায় মাথাপিছু উন্মুক্ত জমির মাপ মাত্র কুড়ি বর্গফুট। লবণ হ্রদের জলাভূমি, ইস্টার্ন বাইপাসের ফাঁকা অঞ্চল দখল করে নিচ্ছে ইট-কাঠ-কংক্রিট। কলকাতায় পার্ক ময়দান এসব নিয়ে দেড় হাজার একর খালি জমি ছিল, তার মধ্যে সাড়ে সাতশো একর ময়দান। তিনশো একর জমি নিয়ে কলকাতায় একশো চারটি পার্ক! দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর, বেলেঘাটার সুভাষ সরোবর মিলিয়ে

চারশো একর। সরকারি গুদাম, বে-আইনী ক্লাবঘর, নয়তো নাটমঞ্চ পার্কের জমি নিয়ে নিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার দশটি পার্কে তৈরি হয়েছে পাতাল রেলের গুদাম, অফিস ঘর। অবশ্য পার্কের জমি পাতাল রেল ফিরিয়ে দিচ্ছে। চিড়িয়াখানার জমি ছাঁটাই করে উঠছে আকাশ-চাটা পাঁচতারা। হায়, কলকাতার সবুজ!

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে নারকেল-মুড়ি গলায় আটকে আসে। পাশে ভরনের পেট মোটা গ্লাসে জল। ভরনের গ্লাস এখন আর হয় না। এ তাঁদের কালীঘাটের বাড়ির পারিবারিক স্মৃতি। গেলাসের গায়ে অক্ষরমালার সতীপ্রসন্ন। তার নিচে সরু লাইনে একটু ঢেউ খেলানো নকশা। মাজতে মাজতে তার অনেকটা আবছা হয়ে গেছে। কাঁসা, হোয়াইট-মেটাল, কাশীর কাঁসা, ভরনের থালা-গেলাস, বাটি-ঘটিতে নাম লেখানোর রেওয়াজ ছিল তখন। বাসনঅলার লোকই বাড়ি এসে খুটখুট করে লোহার ছোট ছেনি দিয়ে—সেসব এখন আর হয়না।

জলে গলা ভিজিয়ে পরিবেশের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আবারও দূষণ সমস্যায় ফেরেন সতীপ্রসন্ন। কলকারখানার বিষ ধোঁয়া প্রতি ঘণ্টায় কলকাতার পঁয়ত্রিশ হাজার লিটার অক্সিজেনকে দূষিত করছে। গাড়ির পোড়া পেট্রল ডিজেল আছে। ভারি বাতাস টানতে ফুসফুসকে অতিরিক্ত শ্রম করতে হয়। এবং ক্রমাগত অভ্যন্তরে এইসব বাতাসী-ক্লেদ জমতে যক্ষ্মা বা ক্যানসারের সম্ভাবনা জন্মে যায়।

কলকাতা আর তার আশপাশের দু' হাজার কারখানার সাতাশ হাজার ফার্নেসের চিমনির মুখ দিয়ে তিনশো ছিয়ানব্বই টন বিষাক্ত ধোঁয়া মিশছে বাতাসে। তার সঙ্গে আছে ষাট হাজার রান্নার উনোনের ধোঁয়া। প্রতি বর্গমাইল বাতাসে প্রতিদিন দুশো একাত্তর মেট্রিক টন দূষিত পদার্থ মিশছে। গোটা ব্যাপারটা ভাবলে গা ছম ছম করে। যেন আইখম্যানের গ্যাস চেম্বারে সবাই একসঙ্গে বসবাস করছে, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

তাঁদের যৌবনে দেখা 'ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে' লেখা ঢেউ খেলানো টিনের ঘেরা জঞ্জাল ফেলার জায়গা নিরুদ্দেশ। তার বদলে বড়

বড় সিমেণ্টের বাঁধানো ডামপিং ইয়ার্ড। শহর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনই হয়ে থাকে। কিন্তু ময়লা তুলে নিয়ে যাওয়ার লরি পর্যন্ত নেই।

অরিন তার স্টোরিতে লিখেছে, কলকাতায় দৈনিক জঞ্জাল জমে দু'হাজার চারশো টন। মাথাপিছু মাত্র সাতশো গ্রাম। এ ময়লা সরানোর জন্যে দৈনিক দু'শোটি লরির দরকার। পুরসভার আছে একশো পঞ্চাশটি লরি। তার মধ্যে চালু একশো তিরিশটি। দিনে সতেরশো টনের বেশি ময়লা সরানো যায় না। জঞ্জালের দূষিত গ্যাস মেশে বাতাসে। কলকাতার খাটা পায়খানা থেকে প্রতিদিন তিন হাজার টন ময়লা সরানো দরকার। তাও হচ্ছে না। এই সব খাটা পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসা দূষণও কলকাতার বাতাসকে খারাপ করে।

তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে দূষণ মুক্ত করার তেমন ব্যবস্থা কই? এর ধোঁয়া বিপজ্জনক। কে শুনবে, কে বলবে? পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিপদ তো আগেই। চেরনোবিলের দুর্ঘটনা—সেকি পরমাণু বোমা পড়ার থেকে কম বিপজ্জনক? আর পাশাপাশি ভোপাল ট্র্যাজেডিও মনে পড়ে যায়। বহুজাতিকের বিষ তো এখনও এই ভারতবর্ষের বাতাসেই। ক'প্রজন্ম ধরে যে ভোপালের মানুষ এই বিষাক্ত ট্রাডিশান বহন করবেন কে জানে!

মুড়ি-নারকেল শেষ হয়ে গেছে। ভরনের গ্লাস থেকে জল খেলেন সতীপ্রসন্ন। তাঁর মনে পড়ল, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গঙ্গার দূষণ। কারখানার তেলকালি, যাবতীয় নোংরা আবর্জনা—সবই নমঃ গঙ্গায় নমঃ। প্রতিদিন হুগলি নদীর জলে মিশছে তিন হাজার টন দূষিত পদার্থ। মানুষ কোথায় যাবে!

তাঁদের বাল্যে গঙ্গায় যে ইলিশের রুপোলি ঝিলিক এই বর্ষায় দেখা যেত, তার স্মৃতি তো শুধু কবিতায়, ছবিতে, অতীত স্মৃতিচারণায়। গভীর সমুদ্রে ইলিশের ঝাঁক ভেঙে দিচ্ছে ট্রলার। নদীর দূষণ ইলিশকে আটকে দিচ্ছে। অথচ এই বর্ষায় যে কোনো বাঙালি গৃহস্থের হেঁসেলে ভাজা ইলিশের ম-ম গন্ধ শুধুই বিধুর নস্টালজিক

স্মৃতি। ইলিশের তেল, লুকা, ডিমভাজা দিয়ে গরম গরম ভাতের স্বাদ—শরীরের সুপ্ত লালা গ্রন্থিগুলি সরস, সতেজ হয়ে উঠতে চায়। হায় ইলিশ! জলের রুপোলি শস্য!

সতীপ্রসন্ন বাইরের আকাশ দেখলেন। আটটা নাগাদ অরিনের আসার কথা। ছেলেটি সময় দিলে সেই সময় রাখে।

রোদে ঝাঁঝ নেই। কেমন যেন বিষাদ আছে। মুড়ির বাটি, মুছে আসা নিজের নাম লেখা ভরনের গেলাস তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে সতীপ্রসন্ন টিনের বেঁটে দরজা ঠেলে কারোর ঢোকার শব্দ পেলেন। ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজছে। আর সঙ্গে সঙ্গে কি দীপেশের পুতুল নাচা বিদেশী ঘড়িও বেজে উঠল!

সময়, গেটের শব্দ বুঝিবা সতীপ্রসন্নর মস্তিষ্ককে জানিয়ে দিল অরিন আসছে। অরিন এসে পড়ল।

টিউবওয়েল পাম্প করে করে উঠোনে হাত ধুতে ধুতে সতীপ্রসন্ন আবারও আকাশের দিকে তাকালেন। মেঘের ফিলটারে অনেকটা আটকে যাওয়া ম্লান রোদ এসে পড়েছে গোটা পৃথিবীর শরীরে। টিউবওয়েল টিপে হাত ধুতে ধুতে একবার গলা খাঁকারি দিলেন সতীপ্রসন্ন। তারপর আরও একবার। অরিন ততক্ষণে তাঁর স্টাডিতে পৌঁছে গেছে।

কাঁসার বাটিতে নারকেল কোরার তেলতেলে কষটুকু কয়েকবার ধুলেও বাটি থেকে একেবারে মুছে যায় না। বার দুই ঝাঁকানি দিয়ে হাওয়ায়, উঠোনে বাটির জল নামিয়ে দিতে দিতে সতীপ্রসন্ন দেখতে পেলেন বাথরুমের টালির চালে এখন অনেক রোদ। মেনতু ভাণ্ডারীর দোকানে খদ্দেরদের ভিড়। তাদের টুকরো সংলাপ। দর নিয়ে কাটাকুটি।

পাঞ্জাবি-পাজামা পরলে অরিনকে দেখতে বেশি ভালো লাগে। কাঁধে ঝোলা, পায়ে স্যানডাক চপ্পল।

অরিন, এবার আমাদের কভার স্টোরি—বলে প্রফেশনাল হাউজ-এর সম্পাদকের মতো মুখ করতে ইচ্ছে হলো সতীপ্রসন্নর। কিন্তু

অরিন তাঁকে কাকাবাবু বলে, আর তিনিও মাসিক কম টাকার এক্সপ্লয়টেশন এবং স্নেহে একই সঙ্গে বেঁধে রাখেন এই যুবককে। এর বেশি মাইনে দেয়ার ক্ষমতা নেই সতীপ্রসন্নর, অথচ অরিনের মতো ছেলে—এত ড্যাশিং পুশিং।

স্টাডি রুমে চৌকির ওপর লেখার জন্যে কাঠের ডেসক। একটা চেয়ার, টেবিল, কিছু ফাইল। বইয়ের আলমারি। অরিন ভারি কাঁধঝোলা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রাখল। খালি গায়ে লুঙ্গি পরা সতীপ্রসন্ন। হালকা সবুজ রঙের হ্যাণ্ডলুম পাঞ্জাবি আর শাদা পাজামা পরা অরিন চৌকিতে বসল। এবং তখনই সিগারেটের গন্ধ টের পেলেন সতীপ্রসন্ন, যেহেতু নিজের তামাকের অভ্যাস নেই, তাই বড় সহজেই এ ঘ্রাণ নাকে আসে। তাড়াতাড়ি একবার ভেতরে গিয়ে বুক কাটা ফতুয়া পরে এলেন। একেবারে খালি গায়ে থাকাটা, হোক না অরিন।

কাকাবাবু, এই সংখ্যার কভার স্টোরি বহুতল বাড়ি যদি করা যায়, অরিন একটু যেন আমতা আমতা করেই কিছু বলতে চাইল। গোল গলা পাঞ্জাবির নিচে, ঘাড়ের পেছনে তার বাঁহাত ছিল—অনেকটা যেন সংকোচেই, চুলকোনোর ভঙ্গিতে। সতীপ্রসন্ন ততক্ষণে চৌকিতে থিতিয়েছেন।

ভালো ভেবেছ। আমিও তাই ভাবছি। অন্তত তিনটে স্টোরি করতে হবে। তার মধ্যে একটা হিউম্যান স্টোরি, ইন্টারভিউ বেসড। বাকি দুটো তথ্য, ডাটা ইত্যাদি নিয়ে। সুভাষ কাল এলে ওকে ছবি করতে বলে দেবে। ভালো, বড় ফোটোগ্রাফ, জানো তো এখন তোমার কমপিটিটর শুধু দৈনিক ভোরের আলো গ্রুপ অফ পাবলিকেশনসই নয়, কমপিটিটর টি. ভি ও। আর স্টোরি করবে, গল্পের ফর্মে। সামনে ইভেন্ট আনবে। তুমি অবশ্য তাই কর, কিন্তু আবারও বলে দিলাম—। যারা সাফারার, এই শহরের ফ্রেমের ভেতর বাড়ি না পেয়ে, ভেঙে পড়ায়, যারা প্রোমোটার—এরকম কয়েকজন এবং পুলিশ। মানুষ হার্ড নিউজ নয়, একটু বেশি গল্পই পছন্দ করে।

অরিন বুঝতে পারছিল না কোন যুক্তিতে সতীপ্রসন্ন তাঁর পুরনো স্টোরি ফ্রেমিংয়ের কায়দা ভেঙে ফেলতে চাইছেন। সে কি শুধুই ভোরের আলো গ্রুপ অফ পাবলিকেশনস আর ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জে ? নাকি নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নে !

মানুষ গল্প পড়তে চায় কাকাবাবু, তাঁর সঙ্গে তথ্য। ইদানীং বাংলা জার্নালিজমের প্যাটার্ন এটাই—অরিনের এ যুক্তিতর্ক সতী-প্রসন্ন বহু দিন মানতে পারেন নি, বরং তাঁর প্রত্যুত্তরে ব্যঙ্গ ছিল। তবে ইদানীং কেন এ অদল-বদল ? তবে কি অস্তিত্ব রক্ষার সংকট ! দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে ?

এইসব কথোপকথনের ফাঁকে একবার এক মিনিট আসছি বলে বাইরে গেল অরিন। ছেলেটা তার সামনে সিগারেট খায় না। অথচ সতীপ্রসন্ন নিশ্চিত এ যাওয়া নিকোটিনের টানে। 'পরিবেশ'-এর নির্বাচিত লেখার ফাইল একটু অন্যমনস্ক হয়েই যেন ওল্টাচ্ছিলেন সতীপ্রসন্ন। তাঁর মনে পড়ল দশ বছর আগে 'পরিবেশ' শুরু করার দিনটি, মহাবোধি সোসাইটিতে সভা। ভেবেছিলেন পাড়ায় পাড়ায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর ইন্টারভিউ ছেপে তাদের নিয়ে আসবেন 'পরিবেশ' আর বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে। অনেক কিছুই হলো না। এক জন্মে হয়ও না বোধহয় সবকিছু। সতীপ্রসন্নর জন্মান্তরে বিশ্বাস নেই। তবু তিনি জানেন বয়েস, গড়িয়ে যাওয়া জীবন মানুষকে শ্লথ করে। বহু ইচ্ছে অপূর্ণ থেকে যায়। গোটা কাগজটাকেই পি.টি.এস-এ ছেপে দেয়ার স্বপ্ন তাঁর আজও আছে। কিন্তু ব্যাপারটা বাস্তবে আসছে না। অথচ 'ভবিষ্যৎ' ছাপায়, বিজ্ঞাপনে, রং আর লে-আউটের কারিকুরিতে, প্রফেশানাল ডিস্ট্রিবিউটিং চ্যানেল দিয়ে মানুষের অভ্যাসে ঢুকছে। বিজ্ঞান চেতনা থেকে গল্প, ফ্যান্টাসি, হররের আধিক্য। এমনকি কখনও গ্রহান্তরের মানব বা মানবীর সঙ্গে এ পৃথিবীর বাসিন্দাদের যৌন-জীবনও গল্পের বিষয় হয়ে থাকে। সতীপ্রসন্ন তো এসব পারলেন না। তিনি গাছ, পাখি, ফুল, মানুষ, সভ্যতা চেনাতে গিয়ে, পরিবেশ আর প্রকৃতি সংরক্ষণের কথা ভেবে দশটা বছর শুধুই ছুটেছেন। সেভাবে

নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী তৈরি হয় নি। কভার স্টোরি করার জন্যে যে বিপুল কমপিটেন্সি থাকার কথা, তাও তাঁর নেই। এমন কি প্রথম প্রথম তিনি তো কভার স্টোরিতে বিশ্বাসীও ছিলেন না। কিন্তু পাঠকের চাহিদা, সবাই করছে, নইলে টিকে থাকা যাবে না—এমন বোধ থেকে তাঁর প্রচ্ছদকাহিনী-পর্বে আসা। তবু চালিয়ে যেতে হয়। এক জায়গায় এসে আর ফেরা যায় না। অন্ধ তাড়নায় সামনে, আরও সামনে······

অরিন ঘরে এলে বাতাসে আবারও পোড়া সিগারেটের গন্ধ পান সতীপ্রসন্ন। আকাশ থেকে মহিমা হয়ে রোদ নেমে এসেছে পৃথিবীতে। অরিন বিছানায় বসে তার থেকে অন্তত তিন দশকের বড় সম্পাদক মুদ্রক প্রকাশককে দেখছিল। অরিন এসেছে বলেই খাদির বুক কাটা ফতুয়া পরেছেন সতীপ্রসন্ন। নিচে দুটি পকেট। সেই ফতুয়া এখন ঘামে ভিজছে, পিঠে, বুকে। বাড়িতে সাধারণত খালি গায়েই থাকেন, বিশেষ করে গরমে।

অরিন কিছু একটা বলার জন্যে উশখুশ করছিল। সতীপ্রসন্ন তাঁর বয়সের অভিজ্ঞতায় আন্দাজ করে নিলেন ঘোরাঘুরির জন্যে অরিন টি. এ চাইছে। অথচ কথাটা বলতে গিয়ে বরাবরের মতোই কিছু সংকোচে, অস্বস্তিতে···। ড্রয়ার খুলে তিনটে দশ টাকার নোট তার সামনে ধরে বললেন, অফিসে গিয়ে ভাউচার সই করে দিও।

পাঞ্জাবির ভেতরের পকেটে টাকাটা রাখতে রাখতে অরিন হাসল, ঘাড় নাড়ল। তার বাদামী কপালে পড়ে থাকা ঘন চুলের গোছ, গালের হালকা লালচে দাড়ি—সব মিলিয়ে যেন যৌবন, আহা যৌবন।

রান্নাঘর থেকে মনোরমা অরিনের জন্যে চা নিয়ে এলেন।—কেমন আছেন কাকিমা—বলতে বলতে অরিন উঠে দাঁড়ায়। দু'কাপ চা টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে মনোরমা বোসো বাবা বোসো, বলে টান হলেন। তার মুখে রান্নাঘরের আঁচটুকু লেগে আছে। কিছু ঘামও।

—আপনি ভালো আছেন কাকিমা? চা টেনে নিতে নিতে অরিন দেখল তার প্লেটে দু'খানি বিস্কুট। সতীপ্রসন্ন চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খান না। তাছাড়া একটু আগে তিনি মুড়ি খেয়েছেন।

মুড়ি খাবে বাবা, দু'টি দেব?

অরিন ঘাড় নাড়ল। খাবে না।

মনোরমা ফিরে গেলেন।

চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে ডুবিয়ে নরম করে ঠোঁট আর জিভের চাপেই তাকে মুখের গভীরে চালান করে দিতে পারল অরিন।

চা খেতে খেতে সতীপ্রসন্ন আবারও জানলার দিকে তাকালেন। সেই পেঁপে গাছটি তার ডালে-পাতায় প্রায় ঘরের ভেতরই সবুজ হাত বাড়িয়েছে। তার ওপর রোদের কারুচিত্র।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে সতীপ্রসন্ন বললেন, অরিন, তুমি আর দাঁড়িও না। আজ থেকেই কাজে বেরিয়ে পড়। লেখা যাতে ছবি সুদ্ধু এ মাসের শেষে অবশ্য জমা পড়ে, তার ব্যবস্থা করবে।

কাঁধে ঝোলা তুলে নিয়ে অরিন আর দাঁড়াল না।

সতীপ্রসন্ন গেট পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। এবং রাস্তায় বেরোবার ঠিক আগের মুহূর্তে অরিন বলল, কাকাবাবু আপনি আজ কটা অব্দি আছেন কলেজ স্ট্রিটে? আমি পারলে একবার যাব।

এলে ভালো হয়। কভার স্টোরির ব্যাপারে আমিও একটু নিশ্চিন্ত হই। মাথায়, সারা গায়ে রোদ মেখে নিতে অরিন রাস্তায় নেমে এল।

আট

রাসবিহারীর রথের মেলা থেকে কেনা পাতিলেবুর কলমের চারা শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে, ভিজে মাটি, কেঁচো তুলে এনে এনে বসাচ্ছিলেন মনোরমা। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাছের পাতারা জলে ধুয়ে ধুয়ে আরও যেন একটু বেশি সবুজ। আকাশে মেঘলা ভাঙা

রোদ। এই শ্রাবণে, বৃষ্টির পর রোদ উঠে এলে তাতে ধার থাকে। মনোরমা খালি গায়ে শুধুমাত্র আঁচল বেড়ানো শরীরে শাবল তোলা-নামানোর ছন্দে ঘামছিলেন।

লেবু গাছের গোড়ায় মাছের আঁশ পোটকা বড় ভালো সার—মনোরমার মনে পড়ল। কাল রাসবিহারীর মোড়ে বাসে ওঠার আগে মেলায় গেছিলেন। উল্টোরথ চলে যাওয়ার পর ভাঙা মেলা। আগেকার সেই ব্যাপ্তি, অনেক জিনিসপত্র, ভিড় এখন আর নেই। সে ছিল তাঁদের যৌবনে, তখনও আদি গঙ্গার ওপর পাকা সেতু হয় নি। কাঠের পোল-ই শুধু,চেতলায় যাওয়ার। তার ওপর দিয়ে টানা রিকশা যায় না। তবু পছন্দমতো গাছ কিনলেন মনোরমা। একটা পাতিলেবুর, কয়েকটা রজনীগন্ধা, একটা ডবল থাক জাপানি বেল ফুল।

অনেকটা গভীর করে লেবু গাছের শেকড় মাটিতে নামিয়ে, তার চারপাশ দিয়ে ধীরে ধীরে ঝুরো ঝুরো আলগা মাটি ছড়িয়ে দিলেন মনোরমা। বৃষ্টিতে শেকড় ধরে যাবে। কাল কালীঘাটের বাড়ি হয়ে মেলা দেখে ফেরার পথে এই বৃক্ষ-সংগ্রহ।

একটু আগে বাথরুম থেকে ফিরেছে দীপেশ। তার সারা গায়ে অডিকোলনের সৌরভ। গুরুজি পাঠিয়েছেন, প্যারিস থেকে এক বিদেশী শিষ্য মারফত। এ মাসের শেষে নেতাজি ইনডোরে বাজাবেন গুরুজি। গোটা শহর জুড়ে ছাপানো পোস্টার পড়বে। হোর্ডিংয়ে গুরুজির বড় ছবি—রেওয়াজ করছেন। কখনও বা বন্দিশ আলাপ এবং ঝালার মুদ্রায়। নিচে স্পনসর করা সিগারেট কোম্পানির নাম, প্রোডাকটের ছবি। এসব লে-আউট দীপেশ কালই দেখেছে।

এই অনুষ্ঠানে দীপেশ থাকবে গুরুজির পাশে। তার নামটুকুও হোর্ডিংয়ে, পোস্টারে, দৈনিকে—টিকিট বিক্রির বিজ্ঞাপনে। খবরটা দীপেশ আগেই কিছু জানত। কাল সকালে উদ্যোক্তারা ব্যাপারটা কনফার্ম করে এইট্টি পার্সেন্ট পেমেন্ট নিয়ে গেছে। নানান বিষাদের মধ্যেও টাকা পেলে ভালো লাগে দীপেশের। কিছু উত্তেজনাও।

আকাশের এই উধাও নীলিমায় কোথাও কোনো মালিন্য নেই।

শাদা মেঘ উড়তে উড়তে আকাশকে যেন খানিকটা শরৎকালীন মেজাজ দিয়েছে। মোটা দাঁড়ার বড় চিরুণীতে চুল আঁচড়তে আঁচড়াতে দীপেশ শিস দিচ্ছিল। ধীরে। শব্দটি শুধু যেন তারই কানে যায়—এমন দমে। ইনডোরে গুরুজির পাশে বসে বাজানো, থাকা। অডি-কোলনের সুঘ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে তার মনও যেন হয়ে উঠছিল সুরভিত। কেন, দীপেশ নিজেও জানে না, এই সুখ আর রোমাঞ্চের মুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল কিছু বিষাদ। শ্রবণা আজও তার জীবনে থাকলে, হয়ত আরও সুগন্ধ-বিধুর হয়ে উঠতে পারত দীপেশ। নাকি উল্টোটাই? ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে কিছু ঈর্ষায় শ্রাবণা আর দীপেশ সরতে সরতে কোথায় কোন কোণে যেন চলে গিয়ে শুধুই ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রতীক্ষা করত?

এই বাজনা ধরে কতকাল থাকবে! টোটাল আনসার্টেন। কিছু কমার্শিয়াল কাজকর্ম করলে—পয়সা তো দরকার। বাঁচতে গেলে সবার আগে টাকা লাগে।

রাগে অধৈর্য হয়ে পড়লে বিরক্তিকর কপাল কুঁচকে চুল ঝাঁকাত শ্রাবণা। এবং দীপেশ এই চাহিদাটুকু পূরণ করতে না পেরে—আমি ওভাবে পারব না—তোমার পড়ানোর টাকায় তো বেশ চলে যাচ্ছে শ্রবণা, কিংবা তুমি ঋত্বিকের মেঘে ঢাকা তারা দেখনি—এসব বলে প্রসঙ্গান্তরে সরে যেতে চাইত। আর এভাবেই সে ক্রমশ শ্রবণার চোখে ওয়ার্থলেস, কুঁড়ে, স্বার্থপর ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত পুরুষ হিসেবে ফুটে উঠেছিল।

দূরত্ব বাড়ছিল। ফাটল বাড়তে বাড়তে যা হয়ে থাকে, ভাঙন—তাই এসেছিল অবধারিতভাবে এই দাম্পত্যে।

দোলনকে একটা ফোন করে ব্যাপারটা জানানোর কথা মনে এলো দীপেশের। তবু তারও আগে একবার শ্রবণাকে মনে পড়ে গেল।

এরকম তো মাঝে মাঝেই হয়। ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে চিরুণীর দাঁড়া দিয়ে ঘাড়ের ওপর উজিয়ে থাকা চুল পাট পাট করে ফেলেছে।

নিখুঁত কামানো গালের ছায়া পড়ল আয়নায়। সামনে ঝুঁকে

আসতে ছায়া ভেঙে গেল। কানের ওপরে, রগে জুলপিতে দু'-একটি শাদা চিহ্ন। দীপেশ মনে করতে চাইল না তার বয়েস হচ্ছে। তবু মনে হলো।

উঠোনে পাতিলেবু, রজনীগন্ধা আর ডবল থাক জাপানি বেল ফুল গাছ পুঁতে টিউবওয়েল টিপে টিপে লোহার শাবল ধুচ্ছিলেন মনোরমা। ধুয়ে, মাটি পরিষ্কার করে না রাখলে শাবল, কোদাল ভালো থাকে না। আর তখনই কোত্থেকে উড়ে আসা এক টুকরো কালো মতো মেঘ বৃষ্টি হয়ে গলে পড়ল সিরিটির মাথায়। কবরখানা, বাঁশঝাড়, মেনকা ভাণ্ডারীর দোকানের টালির চাল, গাছ-গাছালি, পুকুর, ঘরবাড়ি, গোরু, ছাগল, কুকুর, হাঁস সব ভিজে গেল বৃষ্টিতে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় রোদও হাসছিল। ছেলেবেলায় এরকম রোদ আর বৃষ্টি একসঙ্গে নেমে এলে মনোরমারা বলতেন, শেয়াল-কুকুরের বিয়ে হচ্ছে। ঠিক এখনই তাঁর কোনো আশ্রয়ের নিচে যাওয়ার তাড়া ছিল না। চান করবেন। ভিজলে, একটু ভিজে গেলে ক্ষতি কি? বড় জোর গলা ব্যথা হবে, নয়তো একটু সর্দি। সে তো এ বয়েসে আছেই। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবুজ ঘাসের গায়ে তরুণ ব্যাঙেরা লাফাতে লাফাতে কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছিল।

তখনই আকাশের দিকে তাকিয়ে দীপেশের মন খারাপ। শিসে যে সুর ভেসে উঠছিল, তা বন্ধ। এরকম খেপে খেপে বৃষ্টি এলে দোলনের বাড়ি যাওয়া প্রায় অসম্ভবই হয়ে পড়বে। কতটা দূর কাঁকুড়-গাছি! তারপর বৃষ্টিতে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। ফোনে কি পাওয়া যাবে এতখানি দূরত্ব?

নিজের স্টাডিতে বসে সেট স্কোয়ার ফেলে পি. টি. এস-এর নানান অক্ষর পেস্টিং করছিলেন সতীপ্রসন্ন। বাক্য বিন্যাসে, শব্দ গঠনে আগামী সংখ্যা 'পরিবেশ'-এর বিজ্ঞাপন সেটিং করতে করতে তাঁর মনে হচ্ছিল রেগুলার পেস্টার না রেখেও তো এতগুলো বছর তিনি চালিয়ে এলেন। ডেইলিতে যাবে—প্রকাশিত হলো—এই সুসমাচারটুকু। সঙ্গে মলাট-স্টোরি আর দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ, চটকদারি লেখার নাম।

পাশে এই সংখ্যার মলাটের একটা ছোট শাদা-কালো ছবি। বিজ্ঞাপনটি নিয়ে কলেজ স্ট্রিটের অফিসে গেলে 'খবর'-এর বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি এসে নিয়ে যাবে। কালকেই বেরোবে 'খবর'-এর পাঁচের পাতায়। শুধু বক্স রুল আর দু-একটা ভেতরের ছোট রুল 'খবর'-এর আর্টিস্টই করে দেবে। কেবল গায়ের সেলোফেনটুকু মন দিয়ে মাপ মতো লাগিয়ে দিলেন সতীপ্রসন্ন। প্রকাশিত হলো শব্দটি রিভার্সে মাথার ওপর। তারপর 'পরিবেশ'-এর পার্মানেন্ট লোগোটি—এই তো বিজ্ঞাপনের লে-আউট। এতে এত হাতি-ঘোড়ার কি আছে!

স্যানিটারি পায়খানার টালির চাল আর আলকাতরা মাখানো বেঁটে দরজার মাঝে যে ফাঁকটুকু, সেখান দিয়ে অনেকটা আকাশ চোখে পড়ে সুধাপ্রসন্নর। নারকেল গাছের সবুজ পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বৃষ্টির জল পৃথিবীতে ঝরে পড়ছিল। ডান পাশের পাঁচিলে সবুজ মখমল রঙের উজ্জ্বল শ্যাওলা। বৃষ্টি আর মেঘ সরে গেলেই অনেকটা রোদালো নীল আকাশ চোখে পড়ে সুধাপ্রসন্নর। এমনকি নারকেল গাছের গা-ঠোকরানো কাঠঠোকরা, কি গাছ বেয়ে যাওয়া কাঠবেড়ালী—তাও। এরা সবাই জীবনের নিজস্ব ছন্দে।

বৃষ্টি সরে গেলে, গাছের পাতায় লেগে থাকা জল বাতাসের টানাটানিতে কখনও বৃষ্টির মায়া পায়। সুধাপ্রসন্ন বাইরে এসে দেখতে পেলেন আবারও রোদ হেসেছে।

একটু বেলা বেড়েছিল। এগারোটা সাড়ে এগারোটার পর কলেজ স্ট্রিট যেতে গেলে বাসের জন্যে আরও অনেকটা বেশি সময় দাঁড়াতে হয়। মাইতিপাড়া বাসস্টপে সেই পাউডার পাফ চেহারার ফুলফোটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সতীপ্রসন্ন হরিদেবপুর-ধর্মতলা মিনিবাসের অপেক্ষা করছিলেন। উল্টোদিকে তপা কেবিন, শোভা হার্ডওয়ার। ডানদিকে পিচ কলের ধোঁয়া বমি করা চিমনি। পাউডার পাফ চেহারার ফুল গাছে এখন একটি দুটি ফুল। যা পাতার মধ্যেই হারিয়ে যায়। অনেকটা সরে, মোড়ের দিকে পিছিয়ে এসে দেখলেন সিরিটি মোড়ে কোনো ফোর-সি নেই।

এমনই অন্যমনস্কতা, দেরি হয়ে যাওয়ার চাপা টেনশনে ডান দিকে রাস্তার মোড়ে আকাঙ্ক্ষিত মিনিবাসটিকে ভেসে উঠতে দেখলেন। ধীরে বাষ্প পেরিয়ে গাড়িটি এসে দাঁড়াল। হাতল ডান হাতে শক্ত করে ধরে শরীর ভাসিয়ে, পাদানিতে ডান পা-টি দিয়ে নিজস্ব বিন্যাসে বাসে উঠে পড়লেন সতীপ্রসন্ন। সেই বাসের পেছনে পেছনেই প্রায় নিজের ভঙ্গিতে উড়ে চলা দুটি প্রজাপতি, তাঁর চোখে পড়ল না। এমন কত কিছুই যে অধরা অ-দেখা থেকে যায় জীবনে!

সিটে বসে মুদিয়ালি থেকে হাজরা পর্যন্ত তাঁকে নাকে রুমাল চেপে থাকতেই হলো সেকেণ্ডারি স্মোকিং আটকাতে। বাসের গায়ে নো স্মোকিং, সিগারেটের প্যাকেটে সিগারেটের বিজ্ঞাপন-হোর্ডিংয়ে, টি.ভি র পর্দায় খবরের কাগজ ম্যাগাজিনের পাতায় 'ইনজুরিয়াস টু হেলথ'—তবু চেতনা ফেরানো যাচ্ছে না।

বাসেও সিগারেট খেয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যেতে হয়। বিদেশে, বিশেষ করে জাপানে নন স্মোকারদের যাতে সেকেণ্ডারি স্মোকিং না হয়, তার জন্যে আলাদা ধূমপানের ঘর আছে। আর এখানে এটুকু স্বাস্থ্য চেতনা এলো না! বিরক্ত সতীপ্রসন্নর হাজরা থেকে বাসবদলে কলেজ স্ট্রিটে আসতে আরও একঘণ্টা লেগে যায় প্রায়।

অফিসে লোডশেডিং ছিল। গোদরেজের নবতাল আটকানো রোলিং শাটারের গেট, দরজা খুলে ভেতরে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না।

শাটার তুলতে এ বয়েসে কিছু পরিশ্রমই হলো। ঝোলায় টর্চ ছিল। টর্চে আলো এনে ঘরের অন্ধকারটুকুকে কোথাও কোথাও দূরে পাঠিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় মোম-দেশলাই খুঁজে পেলেন। তারপর মোম-জ্বালানো আগুনে যতটা অন্ধকার কাটে! চারপাশে দমচাপা বাড়ি। বাইরের দিকের জানলা বলে কিছু নেই। দিনে রাতে সব সময়েই ইলেকট্রিক আলো জ্বালাতে হয়। লোডশেডিং-এ দুর্বিষহ হয়ে ওঠে ভেতরটা। গরমে ঘামে, শ্বাসপতনের ভ্যাপসা বাতাসে সে এক দুঃসহ পরিবেশ

মোমের আলোয় 'পরিবেশ' প্রকাশিত হলো—এই বিজ্ঞাপনের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন সতীপ্রসন্ন। নাহ্, কোনো ভুল নেই। 'খবর'-এর বিজ্ঞাপন বিভাগের মানুষটি এখন এলে হয়। গায়ের ফুল হাতা শাদা শার্ট খুলে ফেলে শুধু গেঞ্জি পরে কুলকুল ঘামছিলেন। হাতপাখা নাড়ছিলেন। কাঠের তৈরি তালাবন্দী চিঠির বাক্স থেকে আসার সময় আজকের ডাক নিয়ে এসেছেন। কোনো বিজ্ঞাপনের পেমেণ্ট দেয়া চেক নেই। বিজ্ঞাপনের অর্ডারও না। যেমন ডি. এ. ভি. পি পাঠিয়ে দেয় ডাকে। 'পরিবেশ'-এর চিঠিপত্র বিভাগের জন্যে চিঠি, লেখা। কাগজ সম্বন্ধে মন্তব্য। আলগা আলগা চোখ বুলিয়ে রেখে দিলেন। অরিন এসে দেখবে। প্রাথমিক নির্বাচন করে তাঁর হাতে দেবে। বাকিরা বাতিল কাগজের ঝুড়িতে।

এই ঘর ছেড়ে দিলে অন্তত ষাট সত্তর হাজার টাকা সেলামী পাবেন। 'পরিবেশ'-এর নামটা বেচে দিলে আরও হাজার পঞ্চাশ। জীবনে এত শ্রম, এত ত্যাগ স্বীকার, অন্তত এই আর্থিক মূল্যটুকু অর্জন করতে পেরেছে। সান্ত্বনা বোধহয় এইটুকু।

যতীন বরাবরই প্রেস হয়ে আসে। এখনও পৌছয় নি। ফলে মাটির কুঁজো থেকে নিজে নিজেই কাচের গ্লাসে জল গড়িয়ে খেলেন সতীপ্রসন্ন।

চোখের সামনে কিছুক্ষণ অন্ধকারে থাকলে চোখে সয়ে যায়। কেশ শূন্য মাথা, নাক, গাল, চোখের কোল, ঘাড়, পিঠ, বুক, হাঁটু—সব এই গরমে ক্রমাগত উঠে আসা স্বেদবিন্দুতে গলে গলে যাচ্ছিল। সতীপ্রসন্নর মনে হলো এই দম চাপা পরিবেশ থেকে বেরিয়ে বাইরে মহাত্মা গান্ধী রোডে গিয়ে দাঁড়াবেন। সেখানে ট্রামে, বাসে, লরি-ট্যাক্সিতে, জীবনের জটে-জ্যামে তবু কিছু প্রাণের হাওয়া-বাতাস। ভুল করে তালপাতার পাখা হাতেই মহাত্মা গান্ধী রোডের ওপর বেরিয়ে এলেন। আকাশে এখন অনেক মেঘ। এখনই হয়ত ভেঙে বৃষ্টি নামবে। গুমোট হয়ে আছে চারপাশ। তেমন করে বাতাস নেই। হর্নে, গাড়ির শব্দে, লোক চলাচলে, দুপুর দেড়টা দুটোর

জমজমাট কলেজ স্ট্রিট। হাঁটতে হাঁটতে পাতিরামের স্টলে এসে দাঁড়ালেন। গত সংখ্যা কেমন বিক্রি হলো, তার একটা হিসেব পাওয়া যাবে, এদের সঙ্গে কথা বললে। হাতে তালপাতার হাতপাখা ঘামে ভিজে বুক পিঠে লেপ্টে যাওয়া গেঞ্জি গায়ে, পায়ে স্যানডাকের ফিতে বাঁধা জুতো। টাক ঢাকা পাকা চুলের বেড়া ঘামে ভিজে আরও লেপ্টে গেছে।

তিনি পাতিরামের সামনে এসে দাঁড়িয়ে মেঘলা পারিপার্শ্বিক দেখতে লাগলেন। তখনই আকাশ কালো করা মেঘদল হুড়মুড় করে বৃষ্টি হয়ে ভেঙে পড়ল বিধান সরণী, মহাত্মা গান্ধী রোড আর কলেজ স্ট্রিটের মাথায়।

নয়

কানাডা থেকে আসা প্রত্যুষের চিঠি পড়তে অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছিল সুধাপ্রসন্নর। প্রত্যুষ লিখেছে, এবার তাঁর ও অপরাজিতার টিকিট পাঠিয়ে দেবে। তাঁরা দু'জনেই যদি ওদেশে যেতে চান তাহলে এটা করতে কোনো অসুবিধে নেই।

এমন প্রস্তাব বেশ কয়েক বছর ধরেই দিয়ে আসছে প্রত্যুষ। কলকাতায়, কিংবা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এসে সেটল করার স্বপ্ন নেই প্রত্যুষের। পভার্টি লাইনের এত নিচে যে দেশ, যেখানে যাবতীয় অসুবিধে, সেখানে থাকার কোনো মানেই হয় না। তাছাড়া ছেলে-মেয়েদের এডুকেশন ফেসিলিটিস।

সুধাপ্রষন্নর মনে পড়ল প্রত্যুষপ্রসন্ন আমেরিকার বস্টন থেকে চিঠি লিখেছে। বাসন মেজে ডলার রোজগার করে ছাত্র-ছাত্রীরা। এক ঘণ্টা সাত ডলার, গোটা একটা সন্ধ্যা বাসন মাজলে আঠাশ ডলার। বাসন মাজাটাই ছাত্র-ছাত্রীদের মূল রোজগার। আমেরিকার বস্টনে কোনো একটা বিশেষ লেকচার দিতে এসে প্রত্যুষপ্রসন্নের এই

বিবরণী। তার ছাত্রীদের কেউ কেউ কুড়ি ডলার দিয়ে ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট টি. ভি কিনে দেশে ফিরে যাওয়ার সময় গারবেজ-এ ফেলে দিয়ে যায়। এবং নতুনরা, যারা পড়তে আসে, তারা প্রথমেই গারবেজ হান্টিং করে পেয়ে যায় গৃহস্থালীর বহু সামগ্রী। জামাকাপড়, বই সমেত বুক শেলফ, ম্যাট্রেস, টেপ রেকর্ডার।

বাড়ি বদলের সময় কেউ কিছু নিয়ে চলে যায় না। রেখে যায় গারবেজের সঙ্গে। বাড়ির মালিক মালপত্র পুরো খালি করে ঘর ফাঁকা করতে বলেন।

ওদেশটা দেখে এলে মন্দ হয় না একবার, এমন লোভ সুধাপ্রসন্নর অস্তিত্বে ছড়ায়। এ বাড়ি বিক্রি করে শেষ জীবনে প্রত্যুষপ্রসন্নের কাছাকাছি, নাতিদের সঙ্গী হয়ে। ওরা তো আর আসবে না। এমন ভাবলেই বুকের ভেতর কি এক বেদনা তোলপাড় হয়ে ওঠে। স্নেহ এমনই কোনো গোপন ক্ষত।

চুরুটের আগুন নিভে যায় বারে বারে। তার ঘ্রাণ ছড়িয়ে থাকে বাতাসে। জিভে-ঠোঁটে নিকোটিনের তেতোটুকু।

প্রত্যুষ লিখেছে, বস্টনে সিনেমায় যাওয়া বেশ কস্টলি ব্যাপার। ইভনিং শো-এর টিকিট ছ'ডলার। দুপুরের শো-তে সেই টিকিটই কমে গিয়ে তিন ডলার। অস্কার পাওয়া ছবি 'রেন ম্যান' দেখেছে প্রত্যুষ। ডাস্টিন হফম্যান ছবির হিরো। প্রতি উইক এণ্ডে গাড়ি নিয়ে দূরে কোথাও।

ক্যাথি এখন কানাডাতেই আছে। আরও কয়েক মাস প্রত্যুষকে থাকতে হবে বস্টনে। সপ্তাহের পুরো দুধ এনে রাখতে হয় ফ্রিজে। বাজার বেশ দূরে, গাড়িতে চড়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে আনতে হয় জিনিসপত্র। আমেরিকার প্রায় সব জায়গার মতো এখানেও আধা-রান্না করা খাবারের ঢালাও চল। এমনকি প্রায় সেদ্ধ হওয়া ভাতও। একটু নেড়েচেড়ে গ্যাসের উনোনে গরম করে নেয়া শুধু।

চুরুটের মুখে জমা ছাই ঝেড়ে নতুন করে ধরাতে ধরাতে বেশ সময় লাগে। বর্ষায় কলকাতার ট্রাফিক জ্যাম, বিশেষ করে টালিগঞ্জ

ব্রিজ থেকে শুরু করে মহাবীরতলা পর্যন্ত যে নিত্য ধারাবাহিক জ্যাম, তা নিয়ে একটা চিঠির ড্রাফট মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। মামুলি বিষয়, কিন্তু লেখার কায়দায় তাকে লেটারস টু দ্য এডিটর কলমে ছাপার উপযোগী করতে চান সুধাপ্রসন্ন। জানলা দিয়ে ভেসে আসা জোলো বাতাসে প্রত্যুষের চিঠি উড়ে গিয়ে মেঝের ওপর। এলোমেলো হয়ে যায় চিঠি লেখার কাগজ। গরমে, তীব্র লোড-শেডিংয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লান্তিতে সুধাপ্রসন্ন হাই তোলেন।

ধর্মতলা থেকে একবার চেষ্টা করেই দোলনকে ফোনে পেয়ে যায় দীপেশ। ফরেন বুক এজেন্সির এই ফোন দীপেশ মাঝে মাঝেই ব্যবহার করতে পারে। দোকানের মালিক তপন ছিল। ছেলেটি আশ্চর্য ভদ্র এবং বিনয়ী। আর পৃথিবীর যাবতীয় বইয়ের খবর বুঝিবা তার জিভের আগায়। তার সঙ্গে কথা বলে দোলনের নম্বরটি ঘুরিয়ে দেয়া। এবং কি আশ্চর্য, পৃথিবীর বহু বিস্ময়ের একটি যেন তখনই ফুটে ওঠে চোখের সামনে। একবারেই দোলনকে পাওয়া হয়ে যায়।

দোলন, আমি।

বলো—কেমন আছ, সেই যে গেলে, দোলনের কণ্ঠের সঙ্গে টেলিফোন রিসিভারের ভেতর দিয়ে ডোবারম্যানের ফিকে গলা পেল দীপেশ।

পারি নি, এত রকম ঝামেলা।

তুমি আজ একবার আসবে, নয়তো টুমরো—যদি অসুবিধে না হয়—

নারীর এই আহ্বানে যেন বা কিছু যাদু থাকে। দীপেশ আচ্ছা বলে ফোন নামিয়ে রাখে। তখনই মনে হয় কাঁকুড়গাছি যাওয়া বড় জরুরী।

ধর্মতলায় এখন কোনো রোদ নেই। মেঘের ছাতা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলকাতা। তাহলে কি বৃষ্টি নামবে? দীপেশের সঙ্গে তো ছাতা নেই। আকাশ ভাঙলে ভিজে কাক হয়ে যেতে হবে।

দশ

মেঘলা আকাশে কেমন যেন এক নিজস্ব আলো থাকে। দোলনের কাঁকুড়গাছির দোতলার ঘরে এখন বিকেল চারটে। স্ক্রিপট পড়তে গেলে দোলনের সামান্য ভারি ঠোঁট একটু ঝুলে আসে, মুখের অল্প ফাঁকটুকু দোলনকে যেন বা আকর্ষণীয় করে তোলে আরও।

প্রায় মাঝবয়সী পুরুষের কিসে আকর্ষণ, দোলন তা ভালোই জানে। তার ন্যাচরাল কালার লিপস্টিকে, চোখে হালকা আই লাইনারে, চাঁচা ভুরুর ভঙ্গিতে সেই অধরা রহস্যময়তা জড়িয়ে যায়। এবং আনন্দ অথবা বিষাদের আবেগে দোলনের সামান্য হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ, ফুলে ওঠা নাকের পাটা, ভেতরের সংযত উচ্ছ্বাসের ঢেউ শরীরে লাবণ্য আনে। অরুণ এবং দোলনের এই দাম্পত্যহীন, শুধুই এক সঙ্গে নারী-পুরুষ হয়ে কাটিয়ে দেয়া জীবনের ছন্দে দীপেশ তো তৃতীয় মেরু নয়। সেও দোলনের সঙ্গে জীবনের রূপ রস আর রহস্যের রং মেখে নিতে নিতে অন্য এক সহজীবনের মাত্রায়। টান-ভালোবাসা, বিশ্বাস, আশ্রয়, বিশ্বাসভঙ্গ আর ভালো না লাগা সেখানে একই সূত্রে।

অরুণ ওড়িশা গেছে দিন পনের, কি একটা সেলস প্রোমোশনের ব্যাপারে।

দোলন স্ক্রিপট পড়ার ফাঁকে কখনও মণিমালা হয়ে, কখনও দোলন হিসেবে ফিরে এসে সামনের টেবিলে রাখা জিন উইথ লাইমে চুমুক দিচ্ছিল। তার ফরাসি পারফিউম-সুঘ্রাণ, দীপেশের অডিকোলন—দুইয়ে মিলে-মিশে সুরভিত হয়ে উঠেছিল ঘরের বাতাস। রবীন্দ্রনাথের এ কাহিনীর দাম্পত্য বিশ্বাস, নারীর অবস্থান, তখনকার সামাজিক প্রেক্ষিত, কিছু কিছু রাজনৈতিক আন্দোলন, সবই ফুটে উঠছিল দোলনের চিত্রনাট্যে।

স্ক্রিপট পড়ার সময় দোলন দ্রুত সিগারেট বদল করে। ফলে এ বাতাসে কিছু তামাক পোড়া ধোঁয়ার চাদর। জিনের গ্লাসের তলায় আকাশ থেকে চুরি করে আসা মেঘলা ভাঙা আলো বোধহয় ডুবে যাচ্ছিল।

দিনের বেলা কোনো হার্ড ড্রিংকসই পছন্দ নয় দীপেশের। তবু একটা হুইস্কির বড় পেগ নিয়ে তাকে বসতে হয়েছিল। ক্যাজুয়াল স্মোকার দীপেশ ঘোষের হাতেও সিগারেটের অবিরাম দহন।

কপালের ওপর নেমে আসা কাটা চুল, ম্যানিকিওর করা নখে সরিয়ে দিতে দিতে দোলন বলল, কেমন ?

জমেছে। বেশ জমেছে। এপিসোডগুলো তো দারুণ। সঙ্গে সঙ্গে ড্রামার ডেভেলপমেণ্ট, যা দরকার—

জানি না আমার কোনো কোনো ইণ্টারপ্রিটেশন বিশ্বভারতী মঞ্জুর করবে কি না।

না তেমন তো কিছু নেই—বলতে বলতে দীপেশ যেন বা অন্যমনস্ক হয়েই দোলনের হাত ছুঁয়ে ফেলল। ঘরের সবুজ কার্পেটে সিগারেটের ছাই, ক্যাসকো-র খালি প্যাকেট—যে আলুবেসড ভাজা প্রোডাকটি সুন্দর গেটআপের পলিথিন প্যাকেটে জিভের স্বাদ ফেরানোর পক্ষে যথেষ্ট আর ইদানীং আধুনিক জীবন-যাপনের অভ্যাসে। এবং যেন বা ফানমান্‌চের ক্ষণিক, অপলকা প্রতিদ্বন্দ্বীও। খানকয়েক ইলিশ মাছভাজা তখনও পড়ে আছে ডিশে। তার ঘ্রাণে বাতাস ভাসছিল। আর বর্ষার এই দুপুরে ঘরের হাওয়ায় কুকুরের গন্ধও কেমন যেন জড়িয়ে যায়। দোলনের ডোবারম্যান দূরে কোথাও ডাকছিল—এমনি এমনি।

করতলে দোলনের নরম হাত রেখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকা যায়। দীপেশ তাই ছিল। দোলনের সামান্য খয়েরী চোখের তারায়, ভ্রূ-ভঙ্গিতে কিছু বলা না বলা ভেসে উঠে কোন রহস্যে যেন উধাও হয়ে যাচ্ছিল। হাতের ভেতর হাত ঘামে।

নিজেকে সরিয়ে নিয়ে দোলন বলল, তুমি মিউজিক ভেবেছ,

গুরুদেবের গান?

দীপেশ তাৎক্ষণিক ভাবনায়, আসলে তার মাথায় তখন শুধুই নেতাজি ইনডোর—নিজের ভেতর থেকে ফিরে এসে হাত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দোলনের দিকে তাকিয়ে, নিজের প্যাকেটে আর সিগারেট নেই দেখে, দোলনের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিতে নিতে—তুমি তো বঙ্গ-ভঙ্গের সময়টাকে পিন পয়েন্ট করবে ভেবেছ। তাই ধর, বাংলার মাটি বাংলার জল, থিম মিউজিক হিসেবে—তার সামনে তখনও গুরুজির পাশে বসে বাজানোর স্বপ্ন।

ওফ্‌ হো—তুমি না, একেবারেই ট্র্যাডিশনাল—বলতে বলতে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, আরও অনেকটা রহস্যময়তায় ডুবে গিয়ে মাথার ঝামরে আসা শ্যাম্পু করা চুল পেছন দিকে ঠিক করতে করতে দোলন বলল, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে একটা মিছিল আছে, অনেকক্ষণ ধরে। সঙ্গে সেই সময়কার কিছু স্টিল ফোটোগ্রাফস, কিন্তু গল্পের মূল ভরকেন্দ্র কিন্তু বঙ্গভঙ্গ নয়। সেখানে নারীর আত্মমর্যাদা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, ঘুরে দাঁড়ানোর প্রশ্ন। তোমরা—ছেলেরা যেভাবে দিনের পর দিন আমাদের, আই মিন—বলতে বলতে দোলনের গালে কিছু রক্তের উচ্ছ্বাস। আর যেন বা দীপেশ আজও সেই পুরুষ-শাসিত সমাজের প্রতিনিধি, এমন মুদ্রায়, দীপেশকেই অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দোলন উঠে দাঁড়াল। তার এই উঠে দাঁড়ানোর ছন্দে হয়ত বা উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত ভঙ্গিমা! এবং পুরো একটি পরিক্রমায় কার্পেটের ওপর দিয়ে এসে—বাংলার মাটি বাংলার জল নয় দীপেশ—অন্য, অন্য কিছু ভাব। আমি কনভেনশানাল কিছু করব বলে তোমায় দিয়ে মিউজিক করাচ্ছি না। এমন কি যদি কোনো বিশেষ রাগ বা ওয়েস্টার্ন হয়—আমি ডিকটেকট করছি না, কিন্তু তোমায় ভাবতে হবে। বি ক্লাসিকাল দীপেশ, বি মডার্ন।

অনেকক্ষণ সিগারেটে, অ্যালকোহলে একসময় জিভের স্বাদ নেয়ার ক্ষমতা ফুরিয়ে আসে। অথচ দাঁতে নতুন করে সিগারেট চাপতে গেলে আবারও দোলনের প্যাকেটই হাতড়াতে হয়। এই শিষ্টাচার বিরোধী

কাজটা বারে বারে করতে দীপেশের মন চাইছিল না।—তোমার কাজের মেয়েটিকে দিয়ে একটু সিগারেট আনিয়ে দেবে? বলতে বলতে দীপেশ পাজামার সাইড পকেটের রাখা মানিব্যাগে আঙুল ছোঁয়াতে চাইল।

থাক না, আমার প্যাকেট থেকেই নাও।

আমায় তো আনাতেই হবে—বলতে বলতে সে ভেতর দিকে তাকায়। যেন বা সেই কাজের মেয়েটিকে খোঁজাখুঁজি।

সোফা থেকে একটু ঝুঁকে দেয়ালে সুইচ টিপল দোলন। এই ঝোঁকার মাধুরীতে ছন্দ ছিল, যাতে নেশা জাগে। আর বেল বেজে উঠতেই ঝংকারে, কিছুটা যেন সচকিত হয়েই তার কাজের মেয়েটি আলস্যভাঙা চোখে এসে দাঁড়ালে, একটা পঞ্চাশ টাকার নতুন নোট বাড়িয়ে দিল দীপেশ।—এক প্যাকেট ক্লাসিক। কেমন—

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

সুতির হালকা ম্যাকসিতে দোলনকে অনেক কম বয়েসী মনে হয়। এখনও দাঁড়িয়ে। তেমন লম্বা নয়, কিন্তু কোথায় যেন একটা চোরা ব্যক্তিত্ব থেকে গেছে।—ধর, তিনটে গান—তবু মনে রেখো, আমারে তুমি অশেষ করেছ···আর—

আমি ডিফার করি। এটি তার মেল শভিনিজম-এর প্রকাশ কি না, অন্তত দোলনদের অ্যানালিসিসে—বুঝে ওঠার আগে দীপেশ আবারও আগের বাক্যটি একটু জোরে বলে মাথা ঝাঁকায়, তারপর বলে, ভাবতে হবে দোলন। ভাবতে হবে। এ যেন দোলনের কথা দোলনকেই ফিরিয়ে দেয়া।—আমি ভাবব।

লাইম উইথ জিনের তলানি সমেত গ্লাশটুকু হাতে ধরে থাকে দোলন। তার নিচু হওয়ার ছন্দে শরীর ফুটে ওঠে।

অন্তত স্ক্রিপটের শেষটা শোনাও, বলতে বলতে দীপেশ হুইস্কিতে ফিরে যায়।

তুমি ক্যাসেটে কিছু সাজেসটিভ কম্পোজিশান করে শোনাও না আমায়। বলতে বলতে সোফার ওপর হাঁটুমুড়ে বসল দোলন। পেটে

কোমরে একফোঁটা অতিরিক্ত চর্বি নেই। নমনীয় শরীর আশ্চর্য ছন্দে আছে। সকালে উঠে দু'চামচ সুন্দরবনের মধু, পাতিলেবু, গরম জল।

ফ্রি হ্যাণ্ড একসারসাইজের পর এক কাপ মাখন ছাড়া দুধের সঙ্গে শুকনো টোস্ট দু' পিস। দুপুরে এক কাপ ভাত, প্রচুর সবজি, কাঁচা স্যালাড, সামান্য মাছ বা মাংস, টক দই। রাতে দুটো রুটি একটু সবজি, মুরগীর স্টু। মাঝে মাঝে মশলাদার খাবার যে একেবারে খায় না, তা নয়। তবে সবই নিয়মে।

এই বসে থাকার স্থাপত্যে আকর্ষণ ছিল। শরীরের প্রতিটি ভাঁজ স্পষ্ট অথচ স্পষ্ট না, এমন রহস্যে, নিজস্ব বিন্দুতে স্থির। চোরা চাউনিতে দীপেশ একবার দোলনকে দেখেই মিউজিক প্রসঙ্গে ফিরে গেল। তার প্রাণের ভেতর মারুবেহাগের একটি তার খুব ধীরে বাজতে বাজতে মাথার ভেতর ছড়িয়ে পড়ে।

ইদানীং বাংলা ফিল্ম মানেই তো বড় করে পরিচালক গল্প লেখক মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কোনো একটি নাম প্রায় মানুষ প্রমাণ অক্ষরে। ছবির নামও কেমন যেন গ্রাম্য বোকা বোকা। গল্পও তাই। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, গৌতম ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, বিপ্লব রায়চৌধুরী, নব্যেন্দু চ্যাটার্জি—গোটা ইণ্ডাস্ট্রিতে এমনি ব্যতিক্রমী কয়েকজন! তার চেয়ে তো টি. ভি. ফিল্ম, সিরিয়াল অনেক ভালো দোলন। বিশেষ করে ন্যাশানাল নেটওয়ার্কে, অনেক বেশি কমপিটেণ্ট। ভাবনার সুতো ছিঁড়ে দীপেশ বলল, যাই।

এক মিনিট দীপেশ। যাওয়ার আগে প্রিয় নারীর এ-কণ্ঠস্বরে ঠেকে যেতে হয়। দীপেশ চোখ তুলে—কি বলো, এই কথাটুকু অন্তত মুখে ভাসিয়ে তুলতে পারে। তোমার 'মেধাবী' রাগটির কথা মনে আছে? বাবা আলাউদ্দিন বেঁধেছিলেন রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে। তাকে যদি অন্য কোনো ভাবে?

দেখি—বলতে বলতে দীপেশ দোলনের কক্ষচ্যুত হয়ে যায়।

রাতে মহাবীরতলা থেকে আসা সিরিটি পর্যন্ত চুক্তির অটোতে

পেছনের সিটে ধারে বসে অঝোরে ভিজে যায় দীপেশ। এ অটোটির কোনো প্লাস্টিক শিট নেই। যেভাবে বর্ষা মাথায় করে কাঁকুড়গাছি থেকে সন্ধের পর পরই বেরিয়েছিল, তখনই কিছু বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেছিল হয়ত বা। দোলন মানা করেছিল। অনুরোধ ছিল রাতটুকু থেকে যাওয়ার। দীপেশ রাজি হয় নি। ট্যাক্সিতে শেয়ালদা পর্যন্ত এসে, সেখান থেকে আবার ট্যাক্সি বদল করে হাজরা। তারপর মিনিবাসে টালিগঞ্জ ফাঁড়ি।

ব্রিজটুকু পেরিয়ে আসতে আসতে ঝির ঝির বৃষ্টিতে দীপেশ সেঁতিয়ে গেল। তারপর মহাবীরতলা থেকে সিরিটি মোড়ের অটোযাত্রা। প্রতীক্ষায় থেকে থেকে যদি বা পাওয়া যায় তাতেও প্রচণ্ড ভীড়। ড্রাইভার সমেত যেখানে বড় জোর ছ'জন যাওয়ার কথা, সেখানে অনায়াসে আট থেকে ন'জনকে তুলে নিয়ে লাদাই করা। দাঁড়ানো মানুষ বাইরে বৃষ্টিতে ভেজে। তার মাথার ওপর অটোর চাল নেই। শুধু পায়ের নিচে চাকা আর গতি আছে। আর আছে পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া হাওয়া। গা-মাথা ভেজানো বৃষ্টির ছাট।

মানুষকে একটা সময়ের পর ঘরের টানে ফিরতেই হয়। আগে,রাত দশটার পর, রিকশা উল্টোপাল্টা ভাড়া চাইলে হেঁটেই ঘরে ফিরতেন মানুষ। মহাবীরতলা থেকে হেঁটে হেঁটে ভাটিখানা, কলাবাগান, সিরিটি, করুণাময়ী, আরও দূরে হরিদেবপুর। ইদানীং বছর তিনেক অটো চালু হওয়াতে হাঁটার শ্রমটুকু আর অভ্যাসে নেই। ফলে বাস, মিনিবাস না থাকলে আর পায়ের ভরসায় যাওয়া যায় না। গাদাগাদি করে অটোতেই।

ধারে বসার জন্যে দীপেশের বাঁ-দিকটা ছাটে ভিজে যাচ্ছিল। ভিজে পাঞ্জাবি তাড়াতাড়ি লেপ্টে যায় গায়ের সঙ্গে। উল্টো দিক থেকে হর্ন বাজাতে বাজাতে আসে অটো দেখতে দেখতে দীপেশের মনে হচ্ছিল এ যেন বা সেই গ্রহান্তরের কোনো যান—যেমনটি দেখার স্মৃতি স্পিলবার্গের ই. টি ছবিতে। সেও তো কয়েক বছর আগে হেডলাইটের আলোর ওপর ঝরে পড়া বৃষ্টির জলে চারপাশ কেমন যেন

গোলমাল হয়ে যায়। মনেই হয় না এই বৃষ্টিধারার ভেতর তার পরিচিত ভূখণ্ড, জলা, ঝোপ ঘরবাড়ি দু'পাশে ছুটে যাচ্ছে।

অটোতে মহাবীরতলা থেকে সিরিটির মোড় আসতে সময় লাগে সাত আট মিনিট। হাঁটলে, শুকনোর দিনে এ পথটুকু পেরতে লেগে যায় মিনিট কুড়ি সময়। সিরিটির মোড়ে অটো থেকে নামতে নামতে আরও একবার কাকভেজা হয়ে গেল দীপেশ। কিছুতেই মাইতিপাড়া ছাড়িয়ে সুকান্তপল্লীর রাস্তায় পৌঁছে দিতে চাইল না অটো-ড্রাইভার।

এক ছুটে 'আবিষ্কার'-এর বাইরে সামান্য বাড়ানো শেডের তলায় দাঁড়াতে গিয়ে কাদামাখা জলে পা ফেলল দীপেশ, অজানতে। কিছুটা অন্যমনস্কভাবে। কাদাজল ছিটকে উঠে এলো স্পঞ্জ বসানো শাদা চটির জমিতে। টেরিকটের আলিগড়ি পাজামায় কাদা ছিটকে এলো। আর যতটুকু বাকি ছিল, ততটুকু ভিজে বিহ্বল দীপেশ আবিষ্কার-এর সামনে পুরোটাই ভর্তি দেখতে পেল। বৃষ্টি বহু মানুষকে আটকে দিয়েছে।

আনন্দময়ী বাঙালি হিন্দু হোটেলের ভেতরের বেঞ্চিতে জায়গা ছিল। এখানে যারা আড্ডা দেয়, তাদের অনেকেই দীপেশকে চেনে তার গোটা তিন/চার টি. ভি প্রোগ্রামের সূত্রে। এদের কেউ কেউ দীপেশকে দেখে সৌজন্যের দাঁত বের করছিল। পাল্টা দীপেশও।

সে অনেকের মুখও ভালো করে মনে করতে পারছিল না। তবু সৌজন্যে হাসতেই হয়। আগেও দেখেছে দীপেশ, এখানে যে বোবা ছেলেটি প্রায়ই বসে থাকে সে, বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গি করে দেখাচ্ছিল কি ভাবে কাল রাতে পুলিসের হাত থেকে দৌড়ে পালিয়ে বেঁচেছে। এই মাইমের অনেক শ্রোতা এবং দর্শক ছিল। বাংলা মদ, সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ঝুলে ছিল ঘরের বাতাসে।

পেছনে রান্নাঘর থেকে তড়কায় পেঁয়াজ-রসুন-লঙ্কা ফোড়নের গন্ধ, শব্দ ভেসে আসছিল। বেঞ্চিতে পা তুলে বসে দু একজন রাতের খাওয়া সারছিল। সাড়ে তিন টাকায় ডাল ভাত তরকারি।

চালের থেকে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টি টিউবের আলো লেগে কিছু

আলোকিত হয়ে আবারও অন্ধকার পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ছিল। তারা জমা জল বাড়িয়ে দেবে, কাদাকে করবে আরও দীর্ঘায়িত।

অভ্যাসে ডান হাতের চেটো নাকের ওপর থেকে থুতনি পর্যন্ত নামিয়ে আনতে আনতে দীপেশ দোলনের সুঘ্রাণ পেল, এমনকি দোলনের দেয়া সিগারেটের গন্ধও। আর চকিতে, তখনই, যেন তার মাথার ভেতর বেজে উঠল দরবারী কানাড়ার ঝালা।

বোবার মাইমে বোধহয় কিছু রসিকতা ছিল। সকলে হাসছিল তার ভঙ্গিতে। শুধু দীপেশই এ রস বুঝতে পারে নি।

পুরনো, নোংরা ছোপধরা বেসিনে গলা খাঁকরে মুখ ধুচ্ছিল কেউ। খাওয়ার পয়সা হিসেব করে বুঝে নিচ্ছিল হোটেলের মালিক। রান্নার জায়গা থেকে চড়া মশলার গন্ধ উড়ে আসছিল।

দশ

ওয়ে ওয়ে ওয়ে—যেন বা ধাতব কোনো ভৌতিক-ধ্বনি ভেসে আসছিল দোতলার ভাড়াটেদের ক্যাসেট প্লেয়ার থেকে। সতীপ্রসন্ন জানেনও না 'ত্রিদেব' নামের ছবিতে এই গানের সঙ্গে সঙ্গে অসামান্য নেচেছে নাসিরুদ্দিন শাহ্। যা কি না আর্ট ফিল্মের এক বড় আর্টিস্টের পক্ষে বেশ টাফ ব্যাপার।

পুরুষ এবং নারী কণ্ঠে ওয়ে ওয়ে, ওয়ে ওয়ে, ধীর গম্ভীর, কখনও চটুল লয়ে অন্যান্য বাণীর সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছিল।

স্টাডিতে আধশোয়া হয়ে এই মাদকতাময় শব্দমালা শুনতে শুনতে সতীপ্রসন্নর হাই উঠছিল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলেও গরম কম নয়। এখন বেলা সাড়ে আটটা। পাশের রাস্তা দিয়ে 'এ-এ-ছাতা সারাবে, পুরনো ছাতা' বলতে বলতে ছাতা-সারানিয়া মানুষটি চলে গেল।

কাল 'দৈনিক ভোরের আলো'র প্রথম পাতায় 'ভবিষ্যৎ'-এর কভার স্টোরির বিজ্ঞাপনে অরিনের নাম বেরিয়েছে। তিনি দেখেন নি। ব্যাপারটি তাঁকে জানায় প্রুফ আনা-নেয়া করা যতীন। খেলার নানান রকম খবর জানার জন্যে নিয়মিত শুধুই 'দৈনিক ভোরের আলো' দেখে যতীন।

অরিন তাঁকে লেখার বিষয়ে কিছু বলেনি। এমনকি আভাস-ইঙ্গিতেও না। কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি—ব্যাপারটা নিয়ে সতীপ্রসন্নর আপত্তি আছে—জোব চার্নকের জাহাজ ভেড়ানোর তিনশো বছর পূর্তি বরং বলা যেতে পারে, কারণ তার আগেও কলকাতা ছিল, শেঠ-বসাকদের কলকাতা, এমনকি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে—জোব চার্নক সুতানুটিতে তৃতীয় বার নামার অন্তত একশো বছর আগে লেখা হয়েছিল—

'ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়।
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা
বেতোড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা।'

তবু কলকাতা নিয়ে তাঁকেও কিছু করতে হবে। বাজার চায়। অনেক বই বেরোবে, তামাক পুড়বে, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সেমিনারে কলকাতার গলায় মালা পড়বে। কাশী, জেরুজালেম, ভেনিস, বিদিশা, পাটালিপুত্র, এথেন্স, রোম—এর জন্মদিন কখনও হয়েছে বলে তো তিনি শোনেন নি। একি শুধুই কলোনিয়াল লিগেসিকে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া নয়? নাকি শুধুই হুজুগ-সর্বস্বতা? পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগেই, চার্নক সুতানুটি ছোঁয়ার সঙ্গে পরাধীনতার বীজটি পোঁতা হয়ে গেছিল—এমনও তো অনেক সময় মনে হয় সতীপ্রসন্নর। আর তৃতীয়বার আসার তারিখটিকে ধরেই বা কেন জন্মদিন, কেন প্রথমবারের দিনটি নয়? কেনই বা রামমোহনের কলকাতায় আসার তারিখকে আধুনিক কলকাতার জন্মের তারিখ ধরব না—এ সব জিজ্ঞাসা তাঁকে তাড়া করে।

তবু তাঁকেও 'পরিবেশ'-এর অন্তত একটা সংখ্যা করতে হবে, ক্যালকাটা ইস্যু। তার প্রস্তুতি নিতেই আবারও কলকাতা নিয়ে পড়া। মুকুন্দরামে ফিরে যাওয়া। 'ভবিষ্যৎ' আগামী এক বছর ধরে তার প্রচ্ছদ কাহিনীর প্যাকেজ-এর সঙ্গে কলকাতার ওপর একটি বিশেষ প্রবন্ধ দেবে, নানা বিষয় ধরে ধরে—এমন অ্যানাউন্সমেণ্টও 'দৈনিক ভোরের আলো'-র প্রথম পাতায়। এবারে অরিন লিখেছে কলকাতার গাছপালা—ভবিষ্যৎ-এ।

আগামী সংখ্যার জন্যে তিনি তো কলকাতার আকাশ ভেবেছেন। এ-ও কি ঢুকে গেছে 'ভবিষ্যৎ'-এর পরিকল্পনা তালিকায়? ভাবতে ভাবতে অস্বস্তিতে পড়লেন সতীপ্রসন্ন। 'ভবিষ্যৎ'-এ অরিন কলকাতার গাছপালা লিখছে—এ খবরটি তাঁকে জানালে তিনি কি বাধা দিতেন? তবু এ লুকোচুরি খেলা অরিনের—কেমন যেন বেদনায় ডুবে গেলেন সতীপ্রসন্ন। তখনই যেন এই বেদনার সঙ্গে এমন অনুভবও তাঁকে জড়িয়ে যায়—ছ'শো টাকা মাস মাইনে, আর বাড়তি সামান্য কিছু টি· এ-তে মানুষ ভদ্রভাবে বাঁচতে পারে না। এটুকু নিয়মিত দিতেই সতীপ্রসন্নকে বেশ কসরত করতে হয়। তিনি নিজে স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং বাড়ান না। মদ-সিগারেটের নেশা নেই। বাড়িতে ভি সি. আর, কালার টি· ভি নেই। তবু 'কাকাবাবু' ডাকা অরিন তাঁকে তো জানাতে পারত বিষয়টি।

ক্লান্তিতে সতীপ্রসন্নর হাই ওঠে। আকাশে বেশ মেঘ করেছে। মেনতু ভাণ্ডারীর দোকান থেকে ভেসে আসছে ট্রানজিস্টারের ফিকে আওয়াজ। কোনো হিন্দি ফিল্মি গানের কলি। আর আবারও দোতলায় সেই একই ক্যাসেট পাল্টে দিয়ে সুরবন্ধ গোঙানি—ওয়ে ওয়ে ওয়ে—

নিউজপ্রিন্টের দাম যেভাবে বাড়ল, তাতে সামনের সংখ্যা থেকে 'পরিবেশ'-কে চারটাকা থেকে পাঁচটাকা করতেই হবে। 'ভবিষ্যৎ' সাতটাকা। মনে মনে একটা হিসেব করে নিলেন সতীপ্রসন্ন। এ সংখ্যাতেই এ ব্যাপারে একটা অ্যানাউন্সমেণ্ট দেবেন। এত দাম

বাড়ছে কাগজের। ছোট, মাঝারি পত্র-পত্রিকা বাঁচবে কিভাবে?

কলকাতার গাছপালা তো 'পরিবেশ'-এর মলাট কাহিনী হতে পারত, এবং এতো 'পরিবেশ'-এরই বিষয়। একেবারে গোড়ার দিকে এ বিষয় নিয়ে একটা তিন পাতার ফিচার ছাপা হয়েছিল 'পরিবেশ'-এ। তারপর 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' নিয়েও একটা বড় স্টোরি। নতুন আপ টু ডেট ডাটা স্ট্যাটিসটিক্স দিয়ে সুন্দর একটি প্যাকেজ তৈরি হতে পারত। এসব ভাবলেই নানা হতাশা জড়িয়ে ধরে সতীপ্রসন্নকে। লেখকদের একটা গ্রুপ তৈরি হলো না। যাঁদের নামটি নিয়ে তিনি 'পরিবেশ'-এর লেখক বলে গর্ব করতে পারবেন। আর তাঁরাও বুক ঠুকে বলতে পারেন, আমরা 'পরিবেশ' থেকে উঠে এসেছি। তেমন টাকা দিতে পারেন না। সেভাবে কাগজ প্রচারিত নয়। একজন লেখক চাইবেনই তাঁর লেখাটি সর্বাধিক মানুষের কাছে পৌঁছুক। তার ওপর টাকার ব্যাপারটি তো আছেই। তবু অরিন যদি তাঁকে জানাত কাকাবাবু, আমি ভবিষ্যৎ-এ লিখছি, তিনি খুশি হতেন।

সমস্ত খুশি তো মানুষ পেতে পারে না, বেশির ভাগ আনন্দই তার না-পাওয়া থেকে যায়। এই যুক্তিতে, মালিকের রাগে, কাকাবাবুর স্নেহে সতীপ্রসন্ন দোটানায় থাকেন। আর তখনই তাঁর মনে হয় অরিন 'ভবিষ্যৎ'-এ জয়েন করবে না তো, কিংবা দৈনিক ভোরের আলো গ্রুপ অফ পাবলিকেশনস-এ!

ঘরের বাতাসে বৈদ্যুতিক ফ্যানের ব্লেড নাড়া ছাড়া কোনো শব্দ নেই। বাইরের পৃথিবী বৃষ্টির প্রতীক্ষায়। সতীপ্রসন্ন এই সব ভাবনার ক্লান্তিতে, বিষাদে, বিছানায় মাথা রাখলেন। অরিন যদি এখনই 'ভবিষ্যৎ'-এ জয়েন করে, তাহলে তার ফিউচার অনেক ব্রাইট। ভালো মাইনে, নিয়মিত নামের প্রচার, লিখলে বেশি টাকা, সার্ভিস সিকিউরিটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড। দশ বছরের পাগলামিতে 'পরিবেশ' গড়ে তুলে নিতে একলা তো কিছুই করতে পারেননি। ঐ হ্যাণ্ড সেটিং কম্পোজ থেকে লাইনো পর্যন্ত, এই যা। পি. টি. এস-এ কম্পোজ করে, ভিতরে তিন চার ফর্মা কালার দিয়ে—নাহ—এসব বুঝি সারা

জীবনের স্বপ্নই থেকে যাবে।

আকাশ থেকে প্রথম বৃষ্টি নামলে তার দু-চার ফোঁটা বড় ধীরে নেমে আসে পৃথিবীতে। এই মেঘলা, বৃষ্টিনন্দিত আকাশের দিকে তাকিয়ে সতীপ্রসন্নর কেন জানি না ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। টানা ঘুম। দীর্ঘ ঘুমের ভেতর চলে গিয়ে অনেকটা সময় পার করে দেয়া।

অরিন এখনই 'ভবিষ্যৎ'-এ চলে গেলে মলাট-কাহিনী, বিভিন্ন প্যাকেজ তৈরিতে তাঁর অসুবিধে হবে। ওর এত কনটাকটস। তবুও ভেতরে ভেতরে নতুন, বিশ্বাসী, কমপিটেনট—আবার লিখতে পারে এমন ছেলে খুঁজতে থাকবেন সতীপ্রসন্ন। ততদিন অরিন থাক। 'ভবিষ্যৎ'-এ একবার লেখা মানে অরিন আবারও লিখবে, আবার এছাড়া ওদের অন্যান্য অনেক কাগজ আছে। স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট থেকে ভবিষ্যৎ-এ লেখার বিষয়টি ইগনোর করবেন ঠিক করলেন সতীপ্রসন্ন। এ ব্যাপারে তিনি অরিনকে কোনো কথাই বলবেন না। শুধু সামনের সংখ্যা থেকে মলাট-কাহিনী তিনি একা একা ঠিক করবেন। কভার স্টোরি নিয়ে আর পরামর্শ নয় অরিনের সঙ্গে। নিজে নিজে স্টোরি ঠিক করে তাকে অ্যাসাইনমেণ্ট দেবেন। তাতে অন্তত গোপনীয়তা কিছুটা রক্ষা করা যাবে। আর এই সূক্ষ্ম অপমানটুকুতেই যদি অরিন 'পরিবেশ' ছেড়ে দেয়—তাহলে কিছু করার নেই। কাউকেই শেষ পর্যন্ত আটকে রাখা যায় না—এ যুক্তিতে সতীপ্রসন্ন স্থির থাকবেন।

দোতলা থেকে ক্রমাগত ভেসে আসা ওয়ে ওয়ে ওয়ে ওয়ে আ-—আ—আ শুনতে শুনতে দীপেশ দোলনের ফিল্মের মিউজিক করছিল। তার চারপাশে এখন অনেক নোটস। টেপরেকর্ডার, খালি আর ভর্তি ক্যাসেট। দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া—'মম দুঃখের সাধন' শুনতে শুনতে দীপেশ কিছু একটা লিখে নিল।

'এ ভাঙা শিশি বোতল লোহা বই খাতা'—বলতে বলতে যে ছেলেটি ক্যানিং থেকে আসে, তাকে গোটা চারেক আমূল হোল মিল্ক-এর কৌটো বিক্রি করে দিলেন মনোরমা। কিছুতেই ছোট, খালি কৌটো পঞ্চাশ পয়সা করে নিল না ছেলেটি। প্রতিটির দাম চল্লিশ

পয়সা। গুনে গুনে একটাকা ষাট পয়সা আঁচলের গেরোতে বাঁধলেন মনোরমা। এই টাকায় দোক্তাপাতা কিনবেন। বছর পনেরর পুরনো নেশা, যা এখন রক্তে, বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

বৃষ্টি পতন থেমে গেছে। হাওয়ায় এখন তেমন গরম নেই ইনডোরে গুরুজির পাশে বসে বাজানো, আর দোলনের টি. ভি সিরিয়ালে মিউজিক করার স্বপ্নে বিভোর দীপেশ আজ সকালে দাড়ি কামাতেও ভুলে গেছে। না-কামানো গালে পাকা দাড়ি হেসে হেসে জানায়—বয়েস হচ্ছে হে, দীপেশ ঘোষ। বয়েস হচ্ছে। রোদ তখনই তার নিজের অভ্যাসে আকাশে উঠে এলো।

সুধাপ্রসন্ন তাঁর ঘরে আধশোয়া হয়ে চিঠি লিখছিলেন প্রত্যুষ-প্রসন্নকে। পৃথিবী এখন কত ছোট হয়ে গেছে। বস্টন, টোরেন্টো, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন—যেন বা উলুবেড়ে, তারকেশ্বর বা জগাছা। তাঁর ঘরের হাওয়ায় চুরুটের গন্ধ ধীরে মিশছিল। পাশে পড়েছিল কালকের স্টেটসম্যান। সেখানে লেটারস টু দ্য এডিটর কলমে সিরিটি-করুণাময়ী-হরিদেবপুরের সামগ্রিক পরিবহণ সমস্যা নিয়ে তাঁর লেখা চিঠিটি লিড্ চিঠি হিসেবেই ছাপা হয়েছে। আপাতত সুধাপ্রসন্নর মনে এটুকুই সন্তোষ।

'প্রেমের অভিষেক কেন হলো না—তব নয়ন জলে'—শুনতে শুনতে আবারও নোট দিল দীপেশ। দেবব্রত বিশ্বাসের গলায় যে সুর-ধ্বনি, তা তার মাথার ভেতর ধীরে শিকড় ছড়াচ্ছিল। দোলনের ছবিতে এই সুরটিকে—ভাবতে ভাবতে তার চোখ বুজে আসে।

'ওয়ে ওয়ে' তখনও বিরামহীন। তারই ফাঁকে 'চাই বোম্বে বলতে বলতে চলে যাওয়া বিচিত্র হাঁক।

এসবের মধ্যেই সতীপ্রসন্ন ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভবিষ্যৎ-এর ঘর থেকে বেরনোর আগে অরিনের দু'চোখ জ্বালা করছিল। কাচ ঢাকা ছোট টেবিল, গদা আঁটা চেয়ারে উল্টোদিকে তাকে অ্যাসাইনমেণ্ট দেয়ার যে মালিক—বয়েসে হয়ত কিছু ছোটই হবে অরিনের থেকে। শুধু ভারি বাই ফোকাল চশমার অড়ালে বড়, টানা চোখ, চুল উঠে যাওয়া চওড়া তামাটে কপাল এবং থুতনির ফ্রেঞ্চ কাটের গরিমায় সে যেন কিছুটা ভার-ভারিক্কি।

আপনি তো 'পরিবেশ'-এর সঙ্গে আছেন ?

অরিন শব্দ না করে শুধু ঘাড়ের ভঙ্গিতে জানাল—হ্যাঁ।

ভারি চশমার কাচে সিগারেট জ্বালানো লাইটারের শিখা দুটি আলোর ফুল হয়ে ফুটল। চার্মস-এর প্যাকেট লাইটার সবই চলে গেল বুক পকেটে। বাতাস ভারি হয়ে উঠল পোড়া তামাকে।

দেখুন, আপনাকে দশটা স্টোরি ভাবতে বলেছিলাম। আপনি লিস্টও করে এনেছেন—কিন্তু দশটার মধ্যে দুটোর বেশি আপনাকে দিয়ে করাতে পারব না। আমাদের অনেক ফ্রিলান্সার।

টেবলের টেরাকোটা অ্যাশপটে খুব আলতো টুসকি দিয়ে ছাই ঝাড়ল তার উল্টোদিকের ব্যক্তিত্ব। এবং অরিন দেখল ঝাপসা কাচের ওপরে সরু করিডোর দিয়ে কারা কারা যেন চলে যাচ্ছে। কাচ-কাঠের এই বিদেশী অফিস বিদেশী অফিস লে-আউটের ঘরের ভেতরে কি কথা হচ্ছে বাইরে থেকে শোনা যায় না। শুধু ঠোঁট নাড়া চোখে পড়ে।

চেয়ারে কায়দা করে হেলান দিয়ে, ঘাড় একদিকে এনে, ঠোঁটের কোণ দিয়ে পোড়া তামাকের ধোঁয়া শূন্যে পাঠাতে পাঠাতে অরিনকে অ্যাসাইনমেণ্ট দেয়ার মালিক বলছিল, আপনাকে ডিসাইড করতে হবে আপনি আরও অন্যান্য জায়গায় লিখবেন, নাকি শুধুই ভবিষ্যৎ-এ, ভোরের আলো গ্রুপ অব পালিকেশনস-এর অন্য কাগজ-

গুলোতেও। আমাদের পেমেন্ট, আপনি জানেন—বলতে বলতে কথার স্বর তামাকে ফিরে গেল এবং ধোঁয়া এনে ছেড়ে শূন্যে রিং করে আবারও ভাসিয়ে দিয়ে—আমরা দিল্লি বোম্বের কাগজের মতোই টাকা দি। এছাড়া আমাদের সার্কুলেশন, রিডারশিপ, রেগুলার অ্যাড-এ আপনার নাম।

অরিন বুঝতে পারছিল না এই সময়ে একটা সিগারেট ধরানো উচিত হবে কি না। তার নিকোটিনের তৃষ্ণা ছিল। এছাড়া সিগারেট দহনের ঘ্রাণে নেশার সংক্রমণ ঘটেছিল গভীরে। কিন্তু সিগারেট ধারালে ক্ষমতার বিন্দুতে থাকা চেয়ার যদি কিছু মনে করে—এই সংশয়ে অরিন স্থির থাকে।

টেবিলে লাল ইন্টারকম বাজল কোঁ শব্দ করে। কপালে তিনটি ভাঁজ এঁকে—যা কিনা হয়ত এই চেয়ারে বসার উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া—ও ইয়েস, থ্যাঙ্কয়ু, ইত্যাদি শব্দ, মাপা হাসি এবং এগজ্যাকটলি, রাইট, রাইট—ও-কে বলার পর নিপুণ হাতে লাল রিসিভার নামিয়ে রাখা।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম—সরু সোনালী দাগঅলা ফিলটার টিপড-এর দগ্ধাবশেষ টেরাকোটার গর্ভে গুঁজে দিয়ে ভারি বাইফোকাল আবার যেন নিজের কথাতেই ফিরে এসে বলল, একটা কথা আপনাকে বলে রাখি, যে দশটা সাবজেক্ট আপনি দিয়েছেন কভার স্টোরির জন্যে, তার সবগুলোই আমরা ও-কে করেছি, কিন্তু দুটো আপনি করবেন। এনি টু। অন ইওর ওন চয়েস। বাকি আটটা আগেই বলেছি, আমাদের অন্যান্য ফ্রিলান্সার।

এখান থেকে শেয়ালদা স্টেশনে আসা অফিস ভাঙা ভিড় দেখা যায় না। ফ্লাইওভারে কতটা জ্যাম তাও বুঝতে পারে না অরিন। তবু ঘড়ি দেখে তার মনে হলো এখন জ্যাম এবং শেয়ালদামুখী ভিড় আসতে শুরু করেছে।

এই বাকি আটটা স্টোরি নিয়ে আপনি কোথাও আলোচনা করবেন না প্লিজ। এমন কি আমাদের হাউসের অন্য ঘরেও নয়। উল্টো

দিকের চেয়ার আবারও সিগারেট ধরালো। আর এই ‘প্লেজ’-এর ভেতর যেন বা আদেশের বরফখণ্ড ছিল।

খুব কমপিটিশন বুঝতে পারছেন। আলটিমেটলি আপনাকে হয়ত ‘পরিবেশ’ এবং অন্যান্য সমস্ত জায়গার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়তে হবে। আপনি শুধু এক্সক্লুসিভলি আমাদের লেখক হবেন। শুধু আমরাই আপনার লেখা ছাপব।

কাচ ঘেরা ছোট খুপরিতে এই প্রাক-শরতের সন্ধেবেলা সিগারেটের ধোঁয়া দমকে দমকে জমতে জমতে অরিনের চোখ জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। নাকি সূক্ষ্ম কোনো অপমান—যা তাকে লেখক হয়ে ওঠার ব্যাপারে শর্ত হিসেবে দেয়া হয়েছে!

আপনি ইমিডিয়েটলি আমায় কলকাতার পাখিটা করে দিন। বাকি দুটো স্টোরি ঐ দশটা থেকে বেছে বলবেন। কাল পরশু। ও-কে। সমস্ত কর্নার থেকে করবেন। আপনি এক্সপিরিয়েনসড, ব্রাইট ছেলে, বহু কাজ করেছেন। আপনাকে আর কি বলব! ফোটোগ্রাফার ডেকে দিচ্ছি। ডিসাইড করে নিন আপনারা। কালার ট্রান্সপারেন্সি হবে। ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ছবি।

চেয়ারের মানুষ ইনটারকম তুলে ফোটোগ্রাফি চাইল। এবং একজনকে আসতে বলে প্রায় শব্দহীন কৌশলে ইণ্টারকম নামিয়ে রেখে খুব ইণ্টারেস্টিং করে করবেন স্টোরিটা, বলে ছোট করে হাই তুলল।

ফোটোগ্রাফার ছেলেটি, যেমন হয়ে থাকে, কাঁধে মিলিটারির বারবার বক্স, নীল রঙের ঢোলা ব্যাগিস গেঞ্জি, জিনসের ফেডেড ব্যাগিস, পায়ে নর্থ-স্টার। চুল-জুলপিতে মিঠুন, নাকি মাইকেল জ্যাকসন।

অরিন তো তবু বসে আছে। আরও একটি প্লাস্টিকের হালকা চেয়ার খালি ছিল। তবু ফোটোগ্রাফারকে বসতে বলা হলো না। চারটে টি. পি, সঙ্গে নিউমার্কেট, মল্লিকবাড়ি, চিড়িয়াখানা—ও-কে। বাকিটা মিস্টার রাহার সঙ্গে কথা বলে বুঝে নেবে।

অরিনের চোখ জ্বালা করছিল।

ও-কে মিস্টার রাহা, আপনি কাল থেকে লেগে যান। সাতদিনের মধ্যে স্টোরি চাই। আমি ডায়েরিতে লিখে রাখলাম।

তিনতলা থেকে নামার জন্যে অরিন আর লিফটের সামনে দাঁড়াল না। দেরি হবে। তার দু'চোখে তখনও অবিরাম কষ্ট।

রাস্তায় নেমে অরিন দেখতে পেল অজস্র মানুষের মাথা যেন স্রোতে ভাসতে ভাসতে শেয়ালদার দিকে চলেছে। ফ্লাইওভারের গায়ে সন্ধের আলো। কলকাতায় রাত নামছে।

বার

নিউমার্কেটের ভেতর ঠিক এখানেই যে পাখির বাজার, তা আন্দাজে বোঝা মুশকিল। বাইরে অজস্র মোটর সাইকেল, স্কুটার, সাইকেল লাইন দিয়ে শেডের নিচে দাঁড়িয়ে। শনিবারের সকাল দশটার মিনার্ভা, এখন আর মিনার্ভা নেই, চ্যাপলিন হয়েছে। ধর্মতলা, 'চ্যাপলিন'-এর মাথায় পাতলা, কালো এক টুকরো মেঘ ঝুলে আছে। পাশাপাশি দুটো শুয়োরের মাংসের দোকান। এই বর্ষার বেলায় ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে সেখানে লাল মাংস চাকা চাকা করে কাটা হচ্ছে।

অরিনের মনে পড়ল সতীপ্রসন্নর সুকান্ত পল্লীর বাড়িতে যাওয়ার সময় টালিগঞ্জ ব্রিজ পেরনোর আগে বাঁ দিকে শুয়োরের মাংসের দোকান, খাসির মাংস আর ব্রয়লার মুরগীর মাংস বিক্রির জায়গা আছে। তার গা-লাগোয়া বিলিতি মদের দোকান। এবং শুয়োরের মাংস-র দোকানে লেখা আছে শুঁয়োরের মাংস পাওয়া যায়।

মিনার্ভার মাথায় মেঘ ঝুলে থাকায় নিজাম, আর্মিনিয়া, কর্পোরেশন বিল্ডিং, নিউমার্কেট, ফুটপাতের ওপর খুচরো দোকান—সবই মেঘলা অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে।

সরু গলি পেরিয়ে পাখি-বাজারে ঢোকার মুখে অরিন তীর্থঙ্করকে পেয়ে গেল। ঠিক চলে এসেছে দশটার আগেই। একটু এগোলেই বাঁ দিকে ডুমের আলো লাগা বর্ষার অন্ধকার। আর এই ঋতুটিতে মুরগীর খাঁচা থেকে যেমন দমচাপা গন্ধ আসে, তা প্রায় চারপাশেই। একটু ভেতরে ঢুকে গেলে স্টিল আলমারি, ট্রাঙ্কের দোকান। একটা বিশাল সিলিং ফ্যান অনবরত ঘুরে চলেছে, তার ছায়া পড়েছে দেয়ালে।

বাঁ দিকে ঢুকে গেলে অনেকগুলো তারের খাঁচা লাইনবন্দী, পার্টিশনের দেয়ালে ঝোলানো। তার ভেতর বদরি, চুনিয়া-মুনিয়া, —এই সব ডোমেস্টিক, কেজ বার্ডস। কিছু পায়রা। খরগোশ আর শাদা ইঁদুর। বড় রাজহাঁস রয়েছে খাঁচায়। এক জোড়ার দাম একশো টাকা। বেশ কয়েক জোড়া।

তীর্থঙ্কর ক্যামেরা বের করে ছবি তুলতেই প্রায় ছুটে এলো একই রঙের চোস্ত আর পাঞ্জাবি পরা এক যুবক। সিনথেটিক কাপড়ের তৈরি এই পোশাকে তখন বর্ষাদিনের আলো লেগে যাচ্ছে। দেয়ালে ইমরান খাঁ আর জাভেদ মিয়াঁদাদের প্রমাণ সাইজ রঙিন পোস্টার।

আপনি ছবি তুলছেন কেন ? ভাষায় অবাঙালি টান কিছু থেকেই গেছে। তীর্থঙ্কর আবারও ছবি নিল এবং অরিনকে এগিয়ে এসে বলতে হলো, আমরা খবরের কাগজ থেকে এসেছি, একটা রিপোর্ট তৈরি করব। লেখাটা ছাপা হবে। তার সঙ্গে ছবি চাই।

আমাদের এখানকার কোনো ছবি তোলা হবে না। আপনি অন্য জায়গায় যান। একই রঙের কুর্তা-পাজামা রীতিমতো রুখে উঠেছে। এখানে আরও দোকান আছে। সেখানে খবর নিন, ছবি তুলুন।

নির্বিকারভাবে ছবি তুলে যাচ্ছে তীর্থঙ্কর। তার ক্যামেরার ফ্ল্যাশে নতুন নতুন ঝংকার।

কুর্তা-পা-জামার পাশে কমবয়েসী আর একটি শাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি এসে দাঁড়িয়েছে। এবং তার পেছনে পেছনে লুঙ্গি আর ময়লা ছিটের শার্ট পরা এক মধ্য বয়েস। লুঙ্গি শার্ট পরা বেশ কয়েকজন আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। অরিন বুঝতে পারছিল

এরা ছুটকো ক্যাচার, নয়তো দালাল। খাঁচাবন্দী কোনো একটা রাজহাঁস ডেকে উঠল—কোঁয়াক কোঁয়াক। তারপর হয়ত একটা দুটো তিনটে পায়রাও।

মাঝবয়েসী লুঙ্গি আর শার্ট জোড়হাতে—আইয়ে বাবুজি, অন্দর আইয়ে, বলতে বলতে অরিন আর তীর্থঙ্করকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল।

পায়ের কাছে ছুটে বেড়ানো নেংটি ইঁদুর। স্কার্ট পরা একজন বুড়ি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান একটি বাচ্চার হাত ধরে শাদা ইঁদুরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে জোড়া কত জানতে চাইছিল। তার কোঁচকানো মুখের চামড়ায়, হলুদ মতো হাঁটু আর পায়ে, খয়েরি ডাই করা বব চুলে পাখি-বাজারের আলো এবং অন্ধকার খেলা করে যাচ্ছিল। বাচ্চা ছেলেটি হাত ধরে ক্রমাগত ভেতরে টানতে চাইছিল বয়েসকে।

বাবুজি আপলোগ আখবার সে আয়ে তো অন্দর আইয়ে। মেরে গরীব খানে মে বৈঠিয়ে। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রায় একশো বছর আগে কলকাতায় পাখির ব্যবসা করতে এসেছিলেন মানুষটির পূর্বপুরুষ। কথায় এখনও স্বাভাবিক বিনয়, ভদ্রতা, লক্ষ্ণৌয়ের আদব-কায়দা মুছে যায় নি।

এক রঙের কুর্তা-পাজামা তখনও গজ গজ করে যাচ্ছে। তার হাতে অনেকগুলো একশো টাকার নোট।

বাবুজি, কুছ চায় পানি নাস্তা কিজিয়ে। ফিকির মত করে। ও মেরা বড়া লেড়কা। মঝলে লেড়কা খুদখুশি করকে মর গয়ে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ালে নে হমলোগকো তবা করা দিয়া। আতে হ্যায়। ডর দিখাতা হ্যায়। কেয়া করেগা, গরীব আদমি! এক্সপোর্ট ইমপোর্ট-কা লায়সেন্স তো হ্যায় নেহি। আব কবুতর চুহা বেচ রহে হ্যায়। ধান্দা বহুত খারাব হো গয়ে বাবুজি!

অরিন আর তীর্থঙ্করের জন্যে হিমায়িত থামস আপ। এই বর্ষার মেজাজে কোল্ড ড্রিংকসে তেমন মজা নেই। তবু আতিথেয়তার সম্মান দিতেই হয়। পলিথিনের স্ট্র-য়ে থামস আপের বোতল খালি করতে

করতে অরিনের মনে হলো এর থেকে মাজাম্যাঙ্গো হলে ভালো হতো। নয়তো লিমকা।

একদমে পুরো বোতল খাওয়া যায় না। পেটের ভেতর থেকে ঝাঁঝ উঠে আসে। বুক পকেটে রাখা নোট বইয়ে ব্যবসা, টান ওভার, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্ট চালুর বছরটি—এরকম দু একটা পয়েন্ট নোট করে নিচ্ছিল অরিন।

দানা ঠোকরানো পাখিদের ভেতর সব সময়েই একটা পিক পিক কিচিমিচি থেকেই যায়। এখানেও নানা খাঁচা থেকে সেই সব শব্দই ভেসে আসছিল। বহু খাঁচা খালি। বেশ কয়েকটি ভেঙে গেছে। আর স্কার্ট পরা ডাই চুল শাদা ইঁদুরের দাম কমাতে চাইছিল।

অরিন শুনতে পাচ্ছিল পাখি বিক্রি করা এ মানুষটির বড় ছেলে, যার মেজাজ সে এখানে ঢুকেই সপ্তমে দেখেছিল, মুরগীর মাংসের ব্যবসা করে। মাংসের পাখি আসে যায়। পোষার পাখি আনায় অনেক ঝঞ্ঝাট। লাইন ক্রমাগত খারাপ হয়ে যাওয়াতে মেজো ছেলেটি তো সুইসাইডই করেছে। আর আছে ছোট ছেলে এবং এই মাঝবয়েসী মানুষটি।

মাঝে মাঝেই ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফের লোকজন এসে স্টক দেখতে চায়। খাতা-পত্র দেখাও। নতুন কি চিড়িয়া আনলে, তা দেখাও। কে দিল, কোথা থেকে পেলে—নানান প্রশ্ন। হ্যারাসমেন্ট। টাকা খাওয়ার ধান্দা বাবুজি। লুঙ্গি এবং শার্ট বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমার বিশেষ এক মুদ্রায় ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিতে চায়। তীর্থঙ্কর ততক্ষণে বাকি থামস আপটুকু গলায় ঢেলে ফেলেছে। প্রথম থেকেই ওর স্ট্র লাগে নি।

স্ট্র-পথে বাকি তরলটুকু বোতল থেকে নিজের গভীরে টেনে নিতে নিতে অরিন দেখতে পেল খাঁচার মধ্যে মাথার কাছে কালো, নাকি গভীর খয়েরি দাগঅলা রাজহাঁস মাথা উঁচু করে উঠে বসতে চাইছে। তার মাথায়, ঘাড়ে ডুমের আলো।

ফির আনা বাবুজি। আর উয়ো লেখ জেরা হমে দিখানা।

অরিন মাথা নাড়ল। এবং এ প্রতিশ্রুতিটি যে কতবড় সরল-মিথ্যে সে নিজেই তা জানে। ছাপা হয়ে যাওয়ার পর সেই কাগজ বা ম্যাগাজিনে যাঁর কথা লেখা হলো, বা যাঁর ইন্টারভিউ ছাপা হলো, তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়া বাস্তবে কোনোদিনই প্রায় হয় না। তবু অভ্যাসে হ্যাঁ বলতেই হয়। এ প্রফেশনে কোনো না নেই।

দোকানের পেটের ভেতর থেকে সরু গলিপথ দিয়ে তারা আবারও গেটের সামনে এলো। ডানদিকে একটু এগিয়ে গেলেই বাইরে বেরনোর দরজা। আর বাঁয়ে ঘুরে বাজারের আরও ভেতরে চলে গেলে সারি সারি মাংস-পাখি, ঝাঁকা বোঝাই মোরগ-মুরগী। ব্রয়লার, দেশী, রোডাইল, হয়তো লেগহর্নও। কম আলোয় সব কিছু স্পষ্ট করে ধরা পড়ে না।

ভাতের হোটেল আছে এক পাশে। ওখানে কারা কারা যেন ভাত খেয়ে নিচ্ছিলেন ডুমের আলোর নিচে। একপাশে ফালি জায়গায় পা-মেশিন চালাচ্ছিলেন কেউ। ঝাঁকা, পা বাঁধা মুরগীর ঝাঁক টপকাতে টপকাতে অরিন রামচন্দ্র সেনের ভ্যারাইটি বার্ডস এম্পোরিয়াম খুঁজে নিতে চাইছিল। একশো বছর আগে তৈরি এই দোকানের নাম ছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। তীর্থঙ্কর শাটার টিপেই যাচ্ছিল। পুরো রোল এক্সপোজ না করলে তার পরের কাজে অসুবিধে হবে।

তারকবাবু তেমন লম্বা নন, তবে তাঁর স্মৃতি এখন ফেলে আসা অনেকটা সময় দেখতে পায়। ধুতি-শার্টের মানুষটি দুপুরে পাখিদের খাবার দিচ্ছিলেন। তাঁর ছেলে অরিন আর তীর্থঙ্করকে বলল, বসুন।

প্রথমেই কাউকে কিছু বলতে রাজি করানো বেশ শক্ত ব্যাপার। তবু ষাট বছরের তারকমোহন দত্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বলছিলেন, দূর দূর মশাই. নেহাৎ লাইন বদলাতে পারছিনা তাই। পাখি করে এখন আর পেট ভরে না। বড় ছ্যাঁচড়া লাইন হয়ে গেছে। খালি কেজ বার্ড, ডোমেস্টিক বার্ড! কাজে আর মজা নেই। নতুন নতুন আইন আমাদের শেষ করে দিল।

শ্যামা, দোয়েল, পাপিয়া, বৌ-কথা-কও আমিষ-আহারী। এসব

তথ্য বক্স আইটেমের কথা মনে রেখে অরিন নোট বইয়ে লিখে নিচ্ছিল। এক জোড়া মুনিয়া আর বদরির জন্যে লাগে দু ফুট বাই দু ফুট খাঁচা। মুনিয়ার খাবার কাঁকনিদানা, দুধের সর, দুব্বোঘাস। কাঠকয়লা, বালি, শাঁখের গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়ালে এদের স্টমাক ভালো থাকে। এগুলোও তার বক্স আইটেমে যেতে পারে ভাবতে ভাবতে অরিন টুকছিল, ঘাড় নিচু করে, তাড়াতাড়ি।

গণ্ডার ছাড়া সমস্ত বড় জানোয়ার, পাখি এক্সপোর্ট করেছেন তারকবাবু। জয়পুর ফরেস্ট থেকে আনানো হতো বাঘ। চট্টগ্রাম থেকে খেদায় ধরা হাতি আনানো হতো হাঁটিয়ে। ১৯৪৭ সালের আগেই এরকম চারটি হাতি আনানো হচ্ছিল চট্টগ্রামের খেদা থেকে। তখন একটি হাতির দাম আট-ন হাজার টাকা। আনছিলেন ভ্যারাইটি বার্ডস এম্পোরিয়ামের রামচন্দ্র সেন।

এর মধ্যে ভারত পাকিস্তান দুটি আলাদা দেশ হয়ে গেছে। দর্শনা সীমান্তে আটকে দেয়া হলো এই চারটে হাতিকে। ওপারে যাওয়ার অনুমতি নেই।

টুলের ওপর বসা তারকবাবু। তাঁর সামনে পেছনে বেশ কয়েকটি ছোট খাঁচা। এবং বাইরে সরু, এক ফালি আধো অন্ধকার স্পেসে হলুদ কানঅলা কালচে পাহাড়ি ময়না। তারকবাবুর পেছন দিকে কাঠের সিঁড়ি, দোতলার পাটাতনের ওপরে উঠে গেছে। লুঙ্গি শার্ট পরা দু চারজন মানুষ আশেপাশে ছিলেন। তাঁদের হাতে ছোট থলি, নয়তো খাঁচা। এর মধ্যেই উঠে গিয়ে মাঝে মাঝে খরিদ্দারকে পাখি নিয়ে বলছিলেন তারকবাবু। এবং অরিন জানতে পেরেছিল দর্শনা চেক পোস্টের কাছে, তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে এই চারটি হাতি প্রায় অনাহারে মারা যায়। হাজার খানেক টাকা খরচ করে তাদের মাটির নিচে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পাখির রবে মুখরিত ছিল তারকবাবুর দোকান। কাঠের সিলিংয়ে হালকা মতো, পুরনো, জাল ঢাকা ফ্যান ঘুরে ঘুরে গরম তাড়াচ্ছিল। আজ সম্ভবত বাতাসে অনেক হিউমিডিটি। অরিন ঘেমে কূল পাচ্ছিল

না। বর্ষায়, গুমোটে চারপাশ ভারি হয়ে আছে।

বহু খাঁচা খালি পড়ে আছে জানেন! জিনিসই নেই। কি হবে! তারকবাবু একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে উঠে পড়তে চাইছিলেন। অরিনের বাঁ দিকে দেয়ালে ঝোলানো যে ফোটোগ্রাফ, তাতে বোধহয় কলকাতার কয়েকজন নামী অ্যানিমাল একসপোর্টার আছেন।

সরু প্যাসেজ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন তারকবাবু।—আবার আসবেন।

অরিন ঘাড় নাড়ল। এবং সবিনয়ে অনেক সময় নষ্ট করলাম আপনার, বলতে বলতে গলির ফালি অন্ধকারে মিশে গেল। পাশাপাশি তীর্থঙ্কর। সরু স্পেসের র‍্যাকে রাখা খাঁচা থেকে বড় ময়নাটি ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে অরিনকে দেখে নিজের ভাষায় কি যেন বলে উঠল।

মুরগীর গায়ের গন্ধ, অন্ধকার, ঝাঁকা, পালক, পুরীষ পেরিয়ে গেটের বাইরে এসে অরিন দেখতে পেল তাদের চারপাশে যে কলকাতা, তার মাথা থেকে মেঘ সরেনি। এবং একটু এগিয়ে কর্পোরেশন বিল্ডিংসের দিকে গেলে নিজাম থেকে রোলের স্বাদু গন্ধ উড়ে এলো। ফুটপাতে উঠে অরিন সিগারেট ধরাল। তীর্থঙ্করও।

বিফ রোল খাবে? বলতে বলতে তীর্থঙ্কর প্রায় নিজামে ঢুকে গেছে।

তেমন আর শস্তা নয় এখন—বলতে বলতে অরিন তার পেছনে।

বিড় বিড় করতে তীর্থঙ্কর যেন বা নিজেকে শুনিয়েই বলল, ছবিগুলো আণ্ডার হলো কিনা বুঝতে পারলাম না।

ওরা দুজনেই ততক্ষণে নিজাম-এর চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে।

তের

'দৈনিক ভোরের আলো'-র প্রথম পাতায় পরপর তিন দিন বিজ্ঞাপন ছিল 'ভবিষ্যৎ'-এর। তাতে অরিনের নাম দিয়ে তার লেখার নাম—কলকাতার পাখ-পাখালি। তিন কলমের বড় অ্যাড। প্রকাশিত হওয়ার দিন পাঁচের পাতায় বিজ্ঞাপন। যতীন খেলার খবরের জন্যে নিয়মিত ভোরের আলো দেখে। সে-ই সতীপ্রসন্নকে দেখিয়েছিল।

বাড়িতে নিজের স্টাডিতে শুয়ে শ্যাওলা শুকিয়ে আসা পাঁচিলের ওপর দিয়ে দু একটি কাঠপিঁপড়েকে হেঁটে যেতে দেখছিলেন সতীপ্রসন্ন। কাছাকাছি কোনো দোয়েল নেই। তাহলেই এরা শিকার হয়ে যাবে। কয়েকদিন টানা বৃষ্টির পর আজ চরাচর আলো করা রোদ উঠে এসেছে। আকাশের গায়ে এক কুচি কালি নেই। মনে হয় ডিটারজেণ্টে কাচা, পরিষ্কার ঝকঝকে এক নীলাম্বরী।

অজস্র লাল ফড়িং উড়ছিল ডানা মেলে মেলে। তাদের স্বচ্ছ পাখায় প্রাক-শরতের রোদ এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে যাচ্ছিল। পুজো সংখ্যার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এবার প্ল্যানিং একা একাই করছেন। এখনও বুঝতে পারছেন না গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ হালকা ফিচার, না নিউজভিত্তিক লেখার ওপর বেশি জোর দেবেন। না কি দুটোই সমান সমান। মহালয়ার আগেই কাগজ বের করতে হবে। এ নিয়ে টেনসান আছে।

উপন্যাস অবশ্য দুটো পাওয়া হয়ে গেছে। একজন বয়েসে তরুণ। তারটা পুজো সংখ্যায় না ছেপে পরে ধারাবাহিক করে দিলেও চলবে। বিজ্ঞাপন পাওয়ার জন্যে নিজেকেই একটু ছুটোছুটি করতে হবে। এই সময়টাতেই কিছু রোজগার হয় স্পেশাল নাম্বারে বিজ্ঞাপন ছেপে। আর 'ভবিষ্যৎ'-এর আগে যে ভাবেই হোক পুজো সংখ্যা 'পরিবেশ' বাজারে দিতে হবে। তার জন্যে তিন চারটে প্রেসে কাজ ছড়িয়ে

দেয়া দরকার।

ভবিষ্যৎ-এ অরিনের লেখাটা খুঁটিয়ে পড়বেন। আজ অন্য জাসি পড়লেও সে তো তাঁরই লেফটেন্যান্ট। এটুকুই গর্ব সতীপ্রসন্নর।

হাওয়ায় কেমন যেন আলস্য মিশে আছে। শুয়ে থাকলে ক্লান্তি চেপে আসে। পাশ না ফিরে উঠে দরজা দিয়ে সরু বারান্দায় এসে সোজা দীপেশের ঘরের দিকে তাকালেন। দরজা খোলা। কানে হেডফোন, বিশাল সিনথেসাইজার ছড়ানো মেঝেয়। আরও অনেক ক্যাসেট, স্পুল। রেওয়াজ বন্ধ করে নতুন কি এক পাগলামির খেলায় মেতেছে দীপেশ। পা চাপা শাদা আলিগড়ি, তার ওপর ঢিলে রঙিন হাফ পাঞ্জাবি, চুল এলোমেলো।

মাঝে মাঝেই বাঁ হাতের পাঁচ আঙুলে মাথার চুল টেনে ধরছে দীপেশ। সুরে, যন্ত্রণায়, বেঁচে থাকার অসীম ইচ্ছেশক্তিতে তাঁর এই প্রিয়, একটু খামখেয়ালী ভাইপোটি কোনো সৃষ্টির গভীর ডুব দিতে চলেছে—এমনটি বুঝতে পারলেন সতীপ্রসন্ন। আর তখনই দীপেশের পুতুল নাচা বিদেশী ঘড়ি বেজে উঠে সময় জানান দিল।

সামনের দরজা দিয়ে রোদ অনেকখানি লাফিয়ে বারান্দায় এসে পড়েছে। আপাতভাবে এই রোদ্দুরে কোনো পলিউশান নেই।

উঠোনে কুয়োতে বালতি পড়ার শব্দ হলো। বোধহয় মনোরমা জল তুলছেন। বৃষ্টিতে জল কিছু ওপরে উঠে এসেছে। তবু কপিকল লাগে। কোমর হাত এবং শক্তির বিন্যাসে বালতি বোঝাই জল উঠে আসে কূপগর্ভ থেকে।

কুয়োর বাঁধানো পোড়া মাটির গোল পাড়ে একটা শালিক। সতীপ্রসন্ন এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নিচে যে ফালি ঘরটুকু, তার সিমেন্টের জাফরিকাটা ঝরোখা দিয়ে পরিষ্কার নজরে আসে কুয়োতলা। শালিকটি ঘাড় বেঁকিয়ে মনোরমাকে দেখছে।

প্রকৃতিতে এভাবে ডুবে থাকলে কলেজ স্ট্রিট যাওয়ার দেরি হয়ে যাবে। সামনে পুজো সংখ্যা। আর্টিস্টকে দিয়ে অনেকগুলো পিস

ইলাসট্রেট করাতে হবে। এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব সাজেশানস আছে। তারপর ফিনিশ হয়ে গেলে সেগুলো ব্লক করতে দেয়া। একসঙ্গে ব্লকে দিলে কিছু বেশি কমিশন পাওয়া যায়।

কুয়োয় আবার বালতি পড়ল। পাত্র বোঝাই জল উঠে আসবে ওপরে। একা একা যে শালিকটি এতক্ষণ বসেছিল, সে কোথায় যেন উড়ে গেছে। সতীপ্রসন্ন প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে এসে তেলের বাটি গামছা নিলেন। কলতলায় যাবেন। টিউবওয়েল টিপে স্নান করলে জল গরমই লাগে। কুয়োর জলে এখনও বৃষ্টি মিশে আছে। স্নানে গা ভারি হয়ে আসে। স্নানের সময় নাসা করে নাক গলা বুক পরিষ্কার করতে হয় জলের টানে। কলকাতার ধুলো-তেল-কালি ক্লেদ, বেরিয়ে এলে জীবন বাড়ে। ভাবতে ভাবতে সতীপ্রসন্ন টিউবওয়েলের রাস্তায়।

কলতলায় যাওয়ার আগে সতীপ্রসন্ন দেখতে পেলেন চুলের গভীরে আঙুল ডুবিয়ে দীপেশ বসে আছে। ঘাড় নিচু। হেডফোনটি খুলে রাখা আছে সামনে। সামনে বড় সিনথেসাইজার, টেপ ডেক। ক্যাসেট।

কলেজ স্ট্রিট পৌঁছে দোকান খুললেন। লেটার বক্সে চিঠি দেখলেন। এখন আলো আছে। লোডশেডিং হয়ে গেলে এই ঘরে কিছু যন্ত্রণা বাড়ে। যতীনকে দিয়ে পাতিরাম থেকে একটা 'ভবিষ্যৎ' আনালেন। আজই প্রকাশিত হয়েছে। যদিও নিয়মিত এ কাগজটি কেনেন, তবুও এই সংখ্যাটি বিষয়ে বাড়তি কিন্তু কৌতূহল এবং উৎসাহ ছিল।

পাতা উল্টোতে উল্টোতে সহজেই পৌঁছে গেলেন অরিনের স্টোরিতে।

সচরাচর বাংলা উপন্যাসে হয়ত এরকম হয় না। কিন্তু এখানে যেহেতু সবটাই উপন্যাস নয়, তাই সতীপ্রসন্ন অরিনের লেখাটি খুব মন দিয়ে পড়ছিলেন বাস্তবের চোখ নিয়ে। আর আমারও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অরিন যেমন লিখেছিল, তেমনটি পড়ে যেতে থাকি 'ভবিষ্যৎ'-এর পাতা থেকে। লেখাটি অরিন রাহার। প্রকাশিত হয়েছে 'ভবিষ্যৎ'-এ। পড়ছেন সতীপ্রসন্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। দীর্ঘ রচনাটির মাঝে

কোথাও কোথাও সতীপ্রসন্নর নিজের সঙ্গে কথা আছে। যাকে এক-কথায় মন্তব্য বলা যেতে পারে। আমরা অরিনের লেখার সঙ্গে সতীপ্রসন্নর মন্তব্যগুলিও খুব মন দিয়ে পড়ব। কারণ, প্রকৃতিপাঠ তো শুধু উপন্যাসই নয়। হয়ত জীবনও কিছু। আমরা তাই একই সঙ্গে জীবন আর উপন্যাসকে ছুঁতে ছুঁতে সামনে এগোব।

'কলকাতার রাস্তায় হেঁটে যাওয়া দু' কাঁধে বাঁক ঝোলানো পাখি-অলারা ইদানীং প্রায় নিরুদ্দেশ। রোদে-ছায়ায় এক্কাদোক্কা খেলা ফুটপাথ দিয়ে সেই সব খালি পায়ের লুঙ্গিপরা পাখি ফিরি করা মানুষেরা চলে যেতেন নিঃশব্দে।

'তারের খাঁচায় মদনা, ফুলটুসি, চন্দনা, টিয়া। বাঁশের খাঁচায় ময়না। আর থাকত খরগোশ—শাদা আর-কালো—দু'রকমই। কখনও কখনও বাহারি, ফুলকো লোমঅলা অস্ট্রেলিয়ান খরগোশ। আর থাকত গিনিপিগ, শাদা ইঁদুর। চুনিয়া-মুনিয়া, বদরিও থাকত তাঁদের খাঁচায়। বছর কুড়ি বাইশ আগেও বড় হলুদ কানঅলা একটা ময়নার দাম চাইত পাখিঅলা পঁচিশ টাকা। এখন নিউমার্কেট তারই দাম তিনশো চারশো।

'রথের মেলায় পাখি আসত দূর দূর থেকে। শেয়ালদার মৌলালিতে এক মাসের রথের মেলা। সেখানে নানান পাখি, লাল-নীল মাছ, খরগোশ, গিনিপিগের সঙ্গে আসত হরিণ, বাঁদর। রাস-বিহারীর রথের মেলাও বসত একমাস ধরে। তখনও আদি গঙ্গার ওপর পাকা ব্রিজ হয়নি। পাখি আর পাখি—মেলা জুড়ে। রঙিন মাছ, খরগোশও। মৌলালি পেরিয়ে শেয়ালদার ফ্লাইওভার আর আদি গঙ্গার ওপর চেতলা যাওয়ার পাকা পোল এই দুই মেলাকে ছেঁটে দিয়েছে। তার সঙ্গে আছে আরও নানান কারণ।

'পাখিঅলার পায়ে পায়ে অনেকটা দূর হেঁটে গিয়ে কোনো ছায়ালো গাছের নিচে জিরিয়ে, চকচকে মাজা পেতলের থালায় মাখা ছাতু, আচার আর লঙ্কা পেঁয়াজ খেয়ে আরও খানিকটা আলো-ছায়ায় হেঁটে যাওয়ার স্বপ্ন এখনও আছে।

অরিন কি সত্যি সত্যি এখনও ছাতু খেয়ে ফুটপাথে ঘুমিয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখে ?

সতীপ্রসন্ন সংশয়ে থাকেন। এবং আবার তিনি অরিন-এ ফিরে যান—'কিন্তু পাখিঅলারা এখন আর প্রায় আসেনই না। তাঁরা 'ওয়াইল্ড লাইফ' রক্ষকদের তাড়নায় অনেকেই বৃত্তি বদল করে মুটে-মজুর হয়েছেন। যেমন মুটে-মজুর বা অন্য কোনো দৈহিক শ্রমের কাজে চলে গেছেন মানিকতলায় বাঁশের খাঁচা তৈরি করা ডোমেরা, নারকেলডাঙার তারের খাঁচা তৈরির কারিগরেরা।

'অনেকেরই মনে আছে বছর দু'তিন আগে মৌলালির রথের মেলা থেকে খাঁচাসুদ্ধু পাখি নিয়ে জমা করা হয়েছিল থানায়। পরে মামলা করে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে পাখিঅলারা কেজ বার্ড বা ডোমেস্টিক বার্ড বিক্রির অনুমতি পেলেও, সেভাবে নিশ্চন্তে আর পুরনো পেশায় ফিরে আসতে পারেননি।

'এত নিষেধাজ্ঞা, কিন্তু তবুও বেজি মেরে তার পেটে খড় ঢুকিয়ে স্টাফ করে পঞ্চাশ টাকা দরে বিক্রি করা হয় কলকাতার ফুটপাতে। এমনি ভাবেই শো-কেস সাজানোর সামগ্রী হিসেবে পাওয়া যায় মৃত কাঠবেড়ালী, ময়না, ফুলটুসি, টিয়া, বেনে-বৌ, ডানা মেলা চিল, মাছ-রাঙা। এসব নিয়ে বোধহয় বলার কেউ নেই। আর এই গত শীতেও, মানে ১৯৮৯-র জানুয়ারিতে, জানবাজারে ঝাঁকা বোঝাই বালিহাঁস এসেছিল মাংসের জন্যে। একটি বালিহাঁস জ্যান্ত পনের টাকা, মরা দশ। এরাই কত হাজার মাইল পেরিয়ে উড়ে এসেছে হিমালয়ের পা, নয়তো সাইবেরিয়া থেকে। হাঁসেদের কালচে মতো ধূসর ডানায় কলকাতার আলো-অন্ধকার একই সঙ্গে ডুবে যাচ্ছিল, ভেসে উঠছিল। ঝাঁকা বন্দী ঝাপটানির শব্দে হিমালয়ের ধ্বনি পাওয়া যাচ্ছিল কি ? এবং তুষারের ছন্দ ?

এতসব দেখেছে অরিন। আমিও তো দেখেছি জানবাজারে ঝাঁকা বন্দী হাঁস। ভেবেওছিলাম তাদের দু একটাকে কিনে এনে সিরিটির জলে, আকাশে মুক্তি দেব। কিন্তু এমন করে লেখার কথা তো

ভাবি নি।

আমরা আবার অরিনের লেখা পড়ব,'এই সব দেখার বোধহয় কেউ নেই। কলকাতার রাস্তায় শীতে দেখা যাবে কাঠি গাঁথা বগেরি পাখি। তাদের মাংস বড় স্বাদু, নরম। ফ্রিজে রাখা একঘেয়ে ব্রয়লার খেয়ে খেয়ে যে আভিজাত্য-স্বাদে অরুচি জমে, তখন মুখ বদলানোর জন্যে বগেরির কচি মাংস। আহা, চমৎকার! এসব নিয়েও বোধহয় কেউ কথা বলেন না। আর রবিবারের ময়দানে, মনুমেন্ট—নাহ, এখন যা শহীদ মিনার—তার পেছনে সাঁডার তেল বিক্রি করা মানুষদের সঙ্গে তারের খাঁচাবন্দী মসুর ডাল খাওয়া শীতার্ত সরীসৃপ এবং পায়ে শেকল বাঁধা জ্যান্ত ধনেশ, লোহার শিকের ওপর বসা। যে ধনেশ পাখি বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির প্রতীক এবং সম্পূর্ণ অর্থে প্রোটেকটেড। ধনেশ পাখিব ঠোঁট, হাড় ডোবানো এক ধরনের কালচে মতো তেল বিক্রি হয় কলকাতার ফুটপাথে! ধনেশ পাখি মারা বহু বছর নিষিদ্ধ।

'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি বাবু-কালচারের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল পাখি পোষা। বৃটিশ-ভজনা, বাইজী, রক্ষিতা, মদ্যপান, মো-সাহেব. আখড়াই, হাফ-আখড়াই, খেমটা, খেউড়ের সঙ্গে মিশে গেছিল পাখি পোষার রং তামশাটিও।

'রাজা, জমিদার, বাবুদের ছিল পোষা পাখি পায়রা। পায়রা-পাখিদের দানাপানি দিয়ে পরিচর্যা করার জন্যে রীতিমতো মাইনে করা লোক রাখা হতো। পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ির বিশিষ্ট প্রতিভাবান মানুষ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ছিল পাখি পোষার শখ। মাইনে করা কাঁকনিদানা খাওয়ানো মানুষটির নাম ছিল সোনাউল্লা। কবুতর-বাজি করার জন্যে নির্দিষ্ট সময় ছিল। মো-সাহেবদের নিয়ে বাবু পায়রার ওড়াই দেখতেন। অন্যের পায়রা ধরে আনা নিয়ে কাজিয়া, খুন পর্যন্ত হয়ে যেত। তিতির, বটের, বুলবুলি লড়াতেন বাবুরা।

'১৮৫৬-র ৭ ফেব্রুয়ারি ক্ষমতাচ্যুত আওধের (অযোধ্যার) নবাব ওয়াজিদ আলি শা কলকাতার মেটেবুরুজে আসেন। তাঁর বার্ষিক

বৃত্তি ছিল বারো লক্ষ টাকা। ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ১৮৫৮-তে তিনি মুক্তি পান। এবং তখন থেকে মেটেবুরুজে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি জীবজন্তু পাখি পুষতেন। গান-বাজনা ও ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারেও খুব শৌখিন ছিলেন।

'বাবু কালচারের কলকাতায় দামী দাঁড়, খাঁচায় থাকত নানা রং আর চেহারার সব পাখি। তাদের খেজামতও হতো নানাভাবে। খাঁচার ওপর কালো কাপড় ঝুলিয়ে পাখিকে—টিয়া, ময়না, চন্দনা, ফুলটুসিকে, ভক্তদাস রাধাকৃষ্ণ বলো—শেখানোর চেষ্টা দেখা যেত বহু বাড়িতেই। তামা বা পিতলের বাহারি দাঁড়ে ময়না, চন্দনা, কখনও কখনও কাকাতুয়াও গৃহস্থের গব হতো।

বছর দশ/পনের আগেও কলকাতার হাড়কাটার বারবণিতাদের খুব ভোরে পাখির খাঁচা ঝুলিয়ে গঙ্গা স্নানে যেতে দেখার কথা লিখেছে অরিন—একি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, নাকি শোনার? দল বেঁধে চলেছে মহিলারা, তাদের হাতে পাখির খাঁচা।

সতীপ্রসন্ন অরিনের স্টোরিতে ফিরলেন—'আজও বারবণিতা বাড়িতে বেড়াল এবং খাঁচার পাখি প্রায় নিয়মিত ছবি।

'১৯৭১-৭২ সাল থেকে ওয়াল্ড ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্ট নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু হলো কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গে। জীবজন্তু, সঙ্গে পাখি কেনা-বেচাতেও তখন থেকেই নানান বাধা-নিষেধ। বটের, বুলবুল, তিতির লড়ানো বহু আগেই বন্ধ হয়েছিল। খাঁচায় গেরস্থের পোষা পাখি হিসেবে রইল চুনিয়া-মুনিয়া, বদরি, টিয়া, বড়জোর লাভ বার্ড। পুরনো খাঁচায় এক আধটা চন্দনা, ময়না বা মদনা। আর নয়তো খোপবন্দী পায়রার ঝাঁক। কলকাতায় দু' একটি পুরনো বাড়ি ছাড়া এখন তো আর দাঁড় চোখেই পড়ে না।

'কিছু কিছু আদিবাসী অঞ্চলে হাটবারে মোরগ-লড়াই এখনও বাজি আর উত্তেজনায় টান টান করে রাখে দর্শকদের।

'বুলবুল-লড়াই চোখে পড়ে বেনারস, এলাহাবাদ, নয়তো লক্ষ্ণৌয়ে।

লক্ষ্ণৌয়ে আছে ভেড়া আর তিতিরের লড়াইও। এলাহাবাদে আহির (গোয়ালা) সম্প্রদায়ের উঠতি মোচঅলা লৌণ্ডা (কিশোর থেকে যুবক হতে যাওয়া)-দের হাতে বুলবুলির 'আড্ডা' চোখে পড়ত। 'আড্ডা' তৈরি হতো লোহার ইউ শেপ ফ্রেমের ওপর রেশমী সুতো জড়িয়ে জড়িয়ে। ওয়াইয়ের নিচের অংশটির মতো একটি হাতল থাকত। সেটিও লোহার, তাতেও রেশম-সুতোর ঘেরাটোপ। ঝুঁটিঅলা পুরুষ বুলবুলের পায়ে বাঁধা থাকত লাল বা কালো রেশমী কার। লড়াই ঘিরে জমত দর্শক। ইদানীং ভি. ডি. ও-ভি. সি. আর যন্ত্রণা বুলবুলবাজিকে অনেকটাই দূরে সরিয়েছে।

'শীত ঋতুটিতে প্রায় সব আহির পাশী বা চামার নয়তো মুসলমান যুবককেই দেখা যেত তাঁর 'আড্ডা'র মাথায় বুলবুলি বসিয়ে দাঁও লাগাতে চলেছেন।

'কলকাতার জোড়াবাগানে এখনও হয় বুলবুলির লড়াই। আর হয় হাটখোলায়। শীতের রোদে রবিবার রবিবার দু'টি পুরুষ পাখির মল্ল-যুদ্ধ দেখার মতো। পরাজিত বুলবুলির ঝুঁটি কেটে দেয়া হয়। বেশি আহত হলে ছেড়ে দেয়া হয় কলকাতার আকাশে।

'বুলবুলির লড়াইয়ের জন্যে হাটখোলার বাইরে থেকে আসে ওস্তাদ। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির দিনে বুলবুলির লড়াইয়ের ফাইনাল রাউণ্ড হয় এখানে। ট্রফি পায় চ্যাম্পিয়ান পাখি।

কলকাতার শেষ পাখিবাবুরা

'৫০০ বা ৭০০ স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে বড়জোর টবে মানি প্ল্যান্ট, অ্যাকোরিয়ামে রঙিন মাছ রাখা যায়। আর নয়তো চেনে বাঁধা শখের পমেরিয়ান, লাসা আপসু, খুব বেশি হলে স্পিটজ।

'কেউ কেউ ফালি বারান্দায় চুনিয়া-মুনিয়ার খাঁচা ঝোলান—ঐ পর্যন্তই। বাঙালি মধ্যবিত্তের এখন পাখি পোষার জায়গা নেই।

পাখির খিদমত করার সময় নেই। তার শখ, পয়সা খরচের ধারা পাল্টে গেছে।

'কলকাতার চিড়িয়াখানা আর মল্লিকবাড়িকে বাদ দিলে যে ক'জন পাখি এবং জীবজন্তু পোষার শখদার মানুষ আছেন, তাঁদের মধ্যে ৩ নম্বর ক্রাউচ লেন, কলকাতা-১২-র জগন্নাথ-রাধাগোবিন্দ বাড়ির— স্থানীয় মানুষদের কাছে যা পাখিবাড়ি বলেই বেশি পরিচিত— বিমানচাঁদ দাসের নাম নিশ্চয়ই সবার আগে আসবে। আর আছেন বাগুইহাটির সুব্রত চক্রবর্তী, কুমার চ্যাটার্জি, রণজিৎ দাশ, বরুণ মিত্র, কালীঘাটের কালিদাসবাবু প্রমুখ। এক সময়ে ফিল্ম লাইনের বিখ্যাত মানুষ প্রেমা আচ্যির ছিল অনেক পাখি, কাকাতুয়া।

'শোনা যায়, সুব্রত চক্রবর্তী বাড়িতে ময়ূরের বাচ্চা তুলেছেন। তাঁর বাড়িতে সারস আছে, আছে অস্ট্রেলিয়ান কাঠবেড়ালী। কালিদাসবাবুর পাখি ছাড়াও আছে কুকুর।

'নেবুতলা পার্কের কাছাকাছি ক্রাউচ লেনের বিমানবাবুর প্রায় ষাট হলো। বাবা বলাইচাঁদ দাস ছিলেন পাখি সংগ্রাহক। শুধু পাখিই নয়, তাঁর ছিল ঘোড়ার শখ। ১৯৪০-৪৫ সালে বলাইবাবুর সংগ্রহে ছিল চিতা বাঘ। ৭৭-৭৮ সাল পর্যন্ত এ পরিবারের সংগ্রহে ছিল একটি মাদি স্পটেড ডিয়ার। আরও আগে ছিল মাউস ডিয়ার। বলাইবাবু নিজে বড় শিকারী ছিলেন। ওঁর শিকার করা বাঘ আর ভালুকের মুণ্ডুসুদ্ধ চামড়া রয়েছে এ বাড়িতে।

'বিমানবাবুরা পাঁচ ভাই। তাঁদের বিশাল ঠাকুরবাড়িতে অনেক পাখি। দু'টি কাকাতুয়া আছে। একটির বয়েস চল্লিশ, অন্যটির নব্বই। এ বাড়িতে ম্যাকাও ছিল। সেটি বেশ কয়েক বছর আগে বাড়ি পাহারা দেয়া বুলডগের দাঁতে শেষ হয়ে গেছে।

'বিমানবাবু বিবাহিত, একটি পুত্র সন্তানও আছে। কিন্তু তাঁর টান-ভালোবাসার অনেকখানিই এইসব পাখিদের ঘিরে। অন্যান্য ভাইরাও তাঁকে সাধ্যমতো সহায়তা করেন। ভোরবেলা উঠে পাখিদের জল, খাবার দেন বিমানবাবু নিজের হাতে। এ ব্যাপারে তিনি কারোর

ওপর নির্ভর করতে পারেন না। একবার সাবান মেশানো জল খেয়ে বৌ-কথা-কও, পাপিয়া এবং শ্যামা মারা যায়। তাই তখন থেকেই এ সতর্কতা।

'খুব ভোরে পাখি-বাড়িতে গেলে দেখা যাবে বাজারের থলি হাতে বাইরে বেরোচ্ছেন বিমানবাবুর ছোট ভাই, আর বিমানবাবু বাথরুম সেরে চায়ের কাপ হাতে খাঁচার পাশে ঘুরছেন। গোটা বাড়ি জুড়ে তখন রোদ আর পাখির কাকলি।

'চৌকো, বাঁধানো উঠোনের জগন্নাথবাড়িতে তখন পুজোর আয়োজন চলেছে। দোতলার কাঠের রেলিংয়ে ভোরের আলো।

'বিমানবাবুর সংগ্রহে রয়েছে শ্যামা, দোয়েল, সাহেব-বুলবুল, পাপিয়া, বৌ-কথা-কও, দামা, টিয়া, চন্দনা, মদনা, ফুলটুসি (পিপীত্রাস) আগ্‌গিন, ভরত (স্কাইলার্ক)। তাঁর কাছে আছে ওড়িশার শ্যামা আর উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলীর শ্যামা। ঝাড়গ্রাম, ধানবাদ, মেদিনীপুর থেকে আনা পুরুষ কোকিল—আলাদা খাঁচায়। এবং গুলতিতে পা খোঁড়া হয়ে যাওয়া কোকিল-বাচ্চাকে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ থেকে তুলে এনে প্রায় বুকে করে বড় করেছেন বিমানবাবু। দেশী গাছ-গাছড়া আর টোটকা ওষুধে ওর পা অনেকটাই ভালো করেছেন। এখন ভালহৌসির কোকিল তাঁর খাঁচায় সুরে পঞ্চম গায়। আর ফাল্গুন মাসে ডাকে পাপিয়া। বদরি পোষেন না। তাঁর মনে হয় এ বড় নোংরা পাখি। ভীষণ দানা ছড়ায়।

'সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার ছাদে পাখির খাঁচা রোদে দিতে দিতে বিমানবাবু আমাদের চিনিয়ে দিচ্ছিলেন কোনটা গোল্ডেন অরিওলি (বেনে-বৌ) আর কোনটাই বা ব্ল্যাক অরিওলি। তাঁর সংগ্রহে চ্যাটরিন লরি (নূরি) আছে একটি, রেনবো লরিও একটি। বিদেশী এই পাখির দাম অনেক।

'বেনে-বৌ খায় ছাতু, পোকা, মধু, দুধ, কলা। কাকাতুয়ার জন্যে ছোলা, ধান, ভুট্টা, নানারকম ফল বরাদ্দ। দোতলার বারান্দায় ঘোমটা দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ছোট ফোল্ডিং বঁটিতে ঠাকুরের ফল

কাটছিলেন বাড়ির বৌয়েরা। জগন্নাথকে নিবেদিত ফলপ্রসাদই দু'টি কাকাতুয়া খেয়ে থাকে নিয়মিত। অন্যরাও। দুই কাকাতুয়ার জন্যে লোহার বড় দাঁড়। দাঁড়ের দু'পাশে বাটি।

'বিমানবাবু আর তাঁর এক ভাই নেচে নেচে হাত-পা নেড়ে নেড়ে গায়ের জামা খুলে, নাড়িয়ে নাড়িয়ে উঠোনে দুই বয়স্ক কাকাতুয়াকে উত্তেজিত করে বাহারী ঝুঁটি খোলাতে চাইছিলেন। এই দুই কাকাতুয়াই 'কাকাতুয়া কাকাতুয়া' বলতে পারে—স্পষ্ট স্বরে এবং কীর্তনের সুর ভাঁজতে পারে শিস দিয়ে। তারা দু'জনেই বিমানবাবুর শিসের উত্তর দিচ্ছিল।

'আমার মনে পড়ল দেওঘরে বালানন্দজির আশ্রমে দেখা দাঁড়ে বসা একাধিক কাকাতুয়ার স্মৃতি। এবং চেতলার জয়নুদ্দিন মিস্ত্রি লেনের কাছাকাছি একটি কাঠের রেলিংঘেরা দোতলায় বছর কুড়ি পঁচিশ আগে বসবাসকারী এক কাকাতুয়ার ক্রমাগত বলে যাওয়া গালাগালির শব্দগুলি।

'দাঁড়ে ডানা খুলে তার নাচও ছিল দেখার মতো। পায়ে বাঁধা থাকত রুপোর ঘুঙুর। এখন এই একটি কাকাতুয়ার দামই কুড়ি হাজার টাকা প্রায়। একটা ম্যাকাও পঁচিশ হাজার।

লেখার সঙ্গে অরিন দিব্যি নিজের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে দিয়েছে। যেমন প্রতিষ্ঠিত লেখকরা করে থাকেন।

সতীপ্রসন্নর চোখ আবারও অরিনের লেখায়—

'বিমানবাবুরা দু' ভাই উঠোনে নাচছিলেন। দাঁড়ে শেকল বাঁধা বছর চল্লিশের কাকাতুয়া তার উত্তেজিত ঝুঁটিতে হলুদের ঝড় তুলেছিল —যেন বা ফুল ফুটেছে। আর বিমানবাবুর মাথার ওপরে বাঁশের প্রমাণ সাইজের খালি-খাঁচাটি না আসা শরতের হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছিল। যে ময়নাটি ওর বাসিন্দা ছিল, সে বেশ কিছুদিন হলো মারা গেছে। এ খাঁচায় নতুন করে আর ময়না পোষা হয় নি।

'দোতলায় ঢালাই করা পুরনো লোহার রেলিংয়ে ঝোলানো ক্যানারি পাখির খাঁচা। পুরুষটি আছে। মা-পাখি ডিমসহ ভেতরে,

যত্নে চাপাচুপি দেয়া। বিমানবাবুর আশা—ডিম ফুটে ক্যানারির বাচ্চা হবে।

'বাথরুমে গেলে এই চল্লিশের কাকাতুয়াটি বিমানবাবুকে কাশির শব্দ করে করে ক্রমাগত ভ্যাঙায়। যেমনভাবে বিড়ির ধোঁয়ায় বিমান-বাবু কাশেন, ঠিক তেমনি।

'একবার তার বাটির ভুট্টাদানা খাওয়ার জন্যে গোলা পায়রার ঝাঁক দাঁড়ের ওপর উড়ে বসে। দাঁড় কাত হয়ে পড়ে গেলে কাকাতুয়ার শিকলবন্দী পা-টি ভাঙে। সেবারও দেশী ওষুধ আর গাছ-গাছড়ায় বিমানবাবু তাকে সারিয়ে তোলেন।

'ভবিষ্যৎ-এর পাতার ওপর আরও ঝুঁকে সতীপ্রসন্ন ভাবতে চাইছিলেন, বিমানবাবুর গল্পটাকে প্রথমেই কেন আনল না অরিন? ভাবতে ভাবতে তিনি পড়ছিলেন—

'আজ থেকে বছর দশেক আগেও কলকাতা বা তার গা-লাগোয়া মফস্বলে খাঁচা-পালানো টিয়া বা চন্দনা কাক-চিলের তাড়ায় বাড়ির আলসে অথবা রান্নাঘরের জানলায় কোনোরকমে ডানা ঝাপটে আছড়ে পড়ে হাঁপাত। তাকে গামছা বা বাজার করার চটের ব্যাগ দিয়ে ধরে ফেলতেন বাড়ির গিন্নি। তারপর নতুন খাঁচা।

এসব তাহলে অরিনেরও মনে আছে! ভাবতে ভাবতে সতীপ্রসন্ন আবার ও লেখায় ফিরে গেলেন। 'নিঃসন্তান রমণীদেরও পাখিকে জল-ছোলা দেয়া, নাম শেখানো একটি কাজের মধ্যে ধরা হতো বছর কুড়ি আগেও। এখন কারোরই কোনো সময় নেই।

'বিমানবাবু কাকের হাত থেকে বাঁচানো এরকম কয়েকটি পাখিকে আশ্রয় দিয়েছেন নিজস্ব খাঁচায়। এখনও পাখি রোদে দিয়ে কাকের ঠোক্কর পাহরা দিতে হয়। তাঁর তিনতলার খুপরি ঘরে শ্বেত পাথরের মেঝের ওপর সারি সারি খাঁচায় ভরত, আগ্‌গিন। বাঁশের সেই সব বাহারি ছোট খাঁচারা ওঁর বাবার আমলের—বেনারস, লক্ষ্ণৌ, রায়-বেরিলী থেকে আনানো। তাদের দু'-একটির ঝোলানো আংটায় জোড়া ড্রাগনের মুখ খোদাই করা। বেশ কয়েকটি তার ও কাঠির

খাঁচা আধভাঙা, খালি অবস্থায় পড়ে আছে বলাইবাবুর। সব মিলিয়ে তাঁর প্রায় ৩০/৪০টি পাখি। বর্ষায়, শীতে ভালো করে চাপাচুপি দিয়ে রোদে রাখা। পিঁপড়ে যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়।

দোতলার বারান্দায় ঝোলানো খাঁচার ফুলটুসিকে বের করে আদর করছিলেন বিমানবাবু। তাঁর মুখ থেকে চিবনো জর্দা-পান খাচ্ছিল ফুলটুসি। তাকে সহজেই শার্ট বা পাঞ্জাবির পাশ পকেটে রাখতে পারেন। ততক্ষণে রোদে ঝোলানো খাঁচার ভেতরে এক জোড়া হোয়াইট ফিন্‌চ নাচছিল। তাদের খাবার কচি কপি পাতা আর মুরগীর ডিম সেদ্ধ। বিমানবাবু সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলছিলেন, জানেন, কতবার আমি পাখিঅলাদের কাছ থেকে পাখি কিনে ক্যামাক স্ট্রিটে ছেড়ে দিয়েছি।

'এই পাখি পুষতে কত খরচ—তা বিমানবাবুর হিসেবে নেই। উনি মনে করেন, হিসেব করলে শখ হয় না। প্রায় ৩০০ বছর আগে ওড়িশা থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা এই পরিবারটিতে ধ্রুপদী সঙ্গীতের চর্চা আজও বহমান। এ বাড়ির ঝুলন-উৎসবে গান গেয়ে গেছেন বড়ে গোলাম আলি, সুনন্দা পট্টনায়ক, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, আমির খাঁ সাহেব। এবং হালফিল রামকুমার চট্টোপাধ্যায়।

'বিহঙ্গম' নামে একটি পক্ষিচর্চার সংগঠন তৈরি করেছেন বিমানবাবু আর তাঁর বন্ধুরা বছরখানেক হলো। ১৯৪০-এর ২ আগস্ট তার একটি সভা হয়ে গেছে। কলকাতার দক্ষিণে অনেকটা ফাঁকা জায়গা নিয়ে ওঁরা পাখি রাখার জায়গা করার কথা ভাবছেন। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারি কলকাতার সি. আই. টি রোডে সার্জন ডাঃ মোহন শীলের বাড়ি কাকাতুয়া বাচ্চা দিয়েছে।

'এই জগন্নাথবাড়িতে মুনির, গণি, নেয়ামত নামের পাখিঅলারা নিয়মিত আসত। বিহার থেকে আসা এইসব মানুষেরা আর আসেন না। আসলে জঙ্গল কমে যাচ্ছে, ফাঁকা মাঠে বাড়ি-ঘর হয়ে যাচ্ছে। পাখি থাকবে কোথায়? বসবে যে, এমন উঁচু গাছ নেই। তাই মানুষ যত এগোচ্ছে, প্রকৃতি—সবুজ—পাখি—তত পেছচ্ছে। পয়সা দিলেও

পাখির খাবার ফড়িং পাওয়া যায় না। পোকা-মাকড়-ফড়িং, সবই কমেছে। আর সেই সব শৌখিন মানুষেরাও আর নেই।

বিমানবাবুর সঙ্গে মিট করার একটা লোভ থেকেই গেল সতীপ্রসন্নর। খুব তাড়াতাড়ি। এ শহরে এখনও এমন ইন্টারেস্টিং মানুষ!

কলকাতার পাখির বাজার

'বেলেঘাটা খালপোল অঞ্চলের শঙ্কর সরকার প্রতি সোম আর শুক্রবার শেয়ালদার বৈঠকখানা বাজারের এক নম্বর গেটে আসেন পায়রার খাঁচা নিয়ে। গেরোবাজ পায়রা আর গোলা পায়রা—দু' রকমই বিক্রি করে শঙ্কর। শেয়ালদা, বৌবাজারের এই অঞ্চলে সোম আর শুক্রবার নিয়মিত পাখির হাট বসত সকাল আটটা ন'টা থেকে বেলা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত। এখন শুধুই পায়রা আসে। চার পাঁচজন আনেন। সাইকেলের ক্যারিয়ারে, তারের খাঁচায়। গেটের বাইরে। সামনে। ভেতরে বাঁ দিকে বাজারের মধ্যে যে পায়রার ঝাঁকবন্দী, তার উল্টোদিকে সেলুন। মাঝে মাঝে ময়লা বোঝাই কর্পোরেশনের গাড়ি ভিড় সরিয়ে দিচ্ছিল।

'তারের খাঁচার ভেতর শুধু খাওয়া আর ল্যাবরেটরির পরীক্ষার জন্যে গোলা পায়রা। ওড়ানোর জন্যে গেরোবাজ।

কলকাতার পায়রায় কিছুদিন হলো কি এক মড়ক লেগেছে! ঘাড় ঝুলে পড়া এই অসুখে মারা যাচ্ছে বহু পায়রা। হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, দৈব-টোটকা কিছু করেই কিছু হচ্ছে না। বলছিলেন একজন পায়রা-প্রেমী।

'হোমার, সিরাজু, মুক্কি, জ্যাকোবিন, পাউটার (গলাফুলো), ম্যাকরোল, লক্কা, শাগতুম, কালপেটিয়া, লালপেটিয়া, চিনি, পরপন —এ সবই কলকাতার শৌখিন পায়রা। বাবু কালচারের সঙ্গে এর যোগের কথা আগেই বলেছি। শৌখিন পায়রার পায়ে রুপোর ঘুঙুর

বেঁধে দেয়ার রেওয়াজও ছিল। পায়রা হাঁটলে শব্দ হতো ঝুম ঝুম।

'তর্জনী ও মধ্যমা জিভের নিচে দিয়ে বিচিত্র কায়দায় সিটি দিতে দিতে পায়রা ওড়ানোর ছবি এখনও কলকাতার উত্তরে এবং দক্ষিণে। সরু লম্বা বাঁশের মাথায় বাঁধা রঙিন কাপড় নাড়িয়ে নাড়িয়ে মেঘ অথবা আকাশের নীলে লেগে থাকা ছুল্লি হয়ে যাওয়া পায়রাদের নামিয়ে আনার ছবিও আমাদের চেনা। বছর দশ পনের আগেও কলকাতার আকাশ যখন টি. ভি অ্যানটেনা কণ্টকিত হয়ে ওঠেনি, তখন কলকাতার উত্তরে শ্যামবাজার, বাগবাজার, হাতিবাগান, ফড়িয়াপুকুর আর দক্ষিণে কালীঘাট চেতলার বহু বাড়ির ছাদে পায়রা বসার জন্যে বাঁশের বড় বোম তৈরি হতো। পায়রা ওড়ানো, বাচ্চা তোলা, অন্য পায়রা লটকে আনা—এসব বিশারদ মানুষ থাকতেন প্রতি পাড়ায়। এখনও হয়ত এঁদের শেষ বংশধর দু'-একজনকে খুঁজলে পাওয়া যাবে।

সতীপ্রসন্নর মনে পড়ল, তাঁদের কালীঘাটের বাড়ির ছাদে উঠে এখনও দু' একটা বাড়ির চালে পায়রা বসার আড্ডা চোখে পড়ে। প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও পায়রা ওড়ানো কিশোর, তার হাতের বাঁশের লগায় কালো কাপড়।

'হাতিবাগানে প্রতি রবিবার যে পাখির বাজার বসে, তাতে চুনিয়া-মুনিয়া, বদরি, ময়না, টিয়া, লোমঅলা কুকুর, লাল-নীল মাছ তো আসেই। আর আসে পায়রা। বেশ কিছুদিন আগে বাঁদরও আসত। তবে ইদানীং আর পাখির সেই শান্ নেই। মৌলালি আর রাস-বিহারীর রথের মেলার কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

'ধর্মতলার নিউ মার্কেটে 'মিনার্ভা' সিনেমার পেছনে যে শুয়োরের মাংসের দোকানগুলি, তারই গা লাগোয়া পাখি-বাজার। সামনে সারবাঁধা স্কুটার, মোটর সাইকেল, সাইকেল। পাখি বাজারের বেশির ভাগ খাঁচাই খালি। ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্টের টানাপোড়েনে পাখি ব্যবসায়ীরা অনেকেই মুরগীর মাংস বিক্রির লাইনে চলে যাচ্ছেন। তাতেও পেট ভরছে না। রাজহাঁস, খরগোশ, শাদা ইঁদুর, গিনিপিগ, পায়রা, টিয়া, চুনিয়া-মুনিয়া, বদরি বিক্রি করে আর কতদিন পেট

চালানো যাবে ?

'নিউ মার্কেটের এই পাখি-বাজারটিতে জায়গা খুবই কম। আগে এখানে কর্পোরেশনের বাগান ছিল। এখন পাখির বাজার। ৮২-তে বাজার ভাঙার পর এখানে উঠে এসেছে। তেমন আলো-হাওয়া নেই। মশা এবং ইঁদুরের উপদ্রব। শীতেও ফ্যান চালাতে হয়। রামবাবুর 'ভ্যারাইটি বার্ডস এম্পোরিয়াম' ১৮৯০ সালে তৈরি হওয়া পাখি আর জীবজন্তুর দোকান। রামবাবু বেঁচে নেই। ওঁর ছেলে সুনীলকুমার সেন এখন দোকানের মালিক।

'রামবাবুর দোকানটি ছাড়াও পাখি আর জীবজন্তুর পুরনো দোকানের মধ্যে নিউ মার্কেটে রয়েছে 'হোসেন জুস', তারকনাথ দত্তের দোকান।

'মহীউদ্দিন, ইসমাইল, জান মহম্মদের দোকান, কে. সি সেন, এস. কে সেন, দে অ্যাণ্ড দত্ত—এখন অনেকেই আর নেই। দে অ্যাণ্ড দত্তের একজন পার্টনার তারকনাথ দত্ত আলাদা দোকান করেছেন। তিনিই নবীনতম দোকানটির মালিক।

'তারকবাবু মামা রামচন্দ্র সেন। তাঁর কাছেই তারকবাবুর পাখি নিয়ে যাবতীয় জানাজানি। জেলেপাড়া লেনে ছিল রামবাবুর বাড়ি। তারকবাবুর বাড়ি ছিল শশীভূষণ দে স্ট্রিটে। ওঁর বাবা সোনা-রুপোর কাজ করতেন।

'তারকবাবুর বয়েস ৬০। পার্ক ম্যানসনের ন' নম্বর ঘরে থাকা আর্মেনিয়ান লিও-এ-আরা (ডাকনাম—আরা সাহেব) তারকবাবুকে বহু অচেনা পাখি চিনিয়েছেন। অনেক বয়েস হয়ে যাওয়া এই আর্মানি মানুষটির কাছে এখনও দু'চার পিস রেয়ার বার্ড আছে বলে তারকবাবু জানালেন। তবে তিনি সাধারণভাবে অচেনা লোককে পাখি দেখান না। তাঁর স্মৃতিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বার্ড কালেক্টরদের নাম ঠিকানা আছে।

'তারকবাবু আমাদের স্মৃতি ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতে গেছিলেন সবুজ ম্যাগপি পাখি দেখার জন্যে। তখন ব্যারাকপুরে

ওঁর বাগানবাড়ি ছিল। যাঁর নামে এজরা স্ট্রিট, সেই ডেভিড এজরা পাখি জীবজন্তু পুষতেন। অবাঙালি 'শিকারী', 'ক্যাচাররা' তাঁকে বলতেন, 'হিজরা সাহেব'। ভারতীয় যাদুঘরের কাছাকাছি তাঁর বাড়িতে ছিল মিনি চিড়িয়াখানা। কয়েকজন ওড়িশাবাসী তাঁর এই চিড়িয়াঘরের দেখভাল করতেন। ক্যাচারদের বড় সম্মান ছিল এজরা সাহেবের কাছে। তিনি তাঁদের জিনিসের দাম তো দিতেনই। সঙ্গে নগদ বখশিস দিতেন। চেয়ারে বসিয়ে পিঠে হাত দিয়ে কথা বলতেন, সম্মান দিতেন, যত্ন করতেন।

'প্রতি বছর এই শীতের সময় একটি পিঙ্ক হেডেড ডাক (গোলাপ-সার হাঁস) নিয়ে আসত শিকারী। ৬০০ টাকা দিয়ে সেই হাঁস কিনতেন এজরা সাহেব। প্রায় রোজই কুকুর নিয়ে বেড়াতে এসে তিনি তারকবাবুর দোকানে ঢুকতেন।

'মার্বেল প্যালেসের জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক (গাবলুবাবু) পাখি, জীব-জন্তুর ব্যাপারে খুব শৌখিন ছিলেন। একবার একটি অ্যালবিনো (শাদা) ব্ল্যাক বাক, যা প্রায় রেয়ার স্পিসিস তখন, ৩,৬১০ টাকা দিয়ে বিক্রি করে গেল লক্ষ্ণৌয়ের আবদুল মজিদ মিয়াঁ। সে প্রায় ৫০ বছর আগের কথা।

'এজরা সাহেব সেই অ্যালবিনো ব্ল্যাক বাক নিয়ে গেলেন, তারপর গাবলুবাবু এসে খবর পেয়ে আফশোষের একশেষ।

'আর একবার তারকবাবুরা ঠিক করেছিলেন হলদে ফুলটুসি (রুটিনো বস্থুন হেডেড প্যারাকি) পাঠাবেন ইংল্যাণ্ডের কেন্ট-এ। সেই পাখি গাবলুবাবুর দেখে খুবই পছন্দ। তিনি পাখি না পেয়ে রাগ করে চলে গেলেন। তারকবাবুর মামা রামবাবু দোকানে এসে সব শুনে গাবলুবাবুকেই পাখিটি পাঠিয়ে দিতে বললেন।

'সে কলকাতায় এ. সি আকুলি, সি. কে. বি আকুলি, লক্ষ্মীকান্ত আকুলি, বদ্যিনাথ আকুলি, কে. এল আকুলি, ছিলেন নামকরা বার্ডস অ্যাণ্ড অ্যানিমালস এক্সপোর্টার। টালা পোলের কাছে ছিল এঁদের বাড়ি। তখন কলকাতাতেই ছিলেন ৩৫/৪০ জন এক্সপোর্টার।

'তারকবাবুর নিউমার্কেটের দোকান, পাখির খাঁচা আর পাখিদের নিয়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির বেশ কয়েকটি শট নিয়েছিলেন। সেই যে সিদ্ধার্থ সাজা ধৃতিমান আর তার বন্ধু পাখি খুঁজতে নিউমার্কেটে গেছে, তার দৃশ্যমালা।

'ভ্যারাইটি বার্ডস-এর কর্মচারী পরেশ দত্ত বললেন, বাঘ, হরিণ, হাতি সবই এক্সপোর্ট হতো একসময় এই কোম্পানি থেকে। কিনত সার্কাস কোম্পানি, চিড়িয়াখানা, প্রাইভেট কালেকটররা।

'মহম্মদ আলির দোকানটি একশো বছরের ওপর। লক্ষ্ণৌ থেকে আসা এই পরিবারটি বহুদিন কলকাতায়। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্টের জন্যে এঁদের সব খাঁচাই প্রায় ফাঁকা। মহম্মদ আলির এক ছেলে মুরগীর মাংসের ব্যবসা করছেন।

'কলকাতা ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও এমন পাখির বাজার ছিল না। সম্প্রতি দিল্লি এবং বোম্বেতে পাখির বাজার হয়েছে।

পাখি ও শিকারী

'পোষা ডাহুক দিয়ে ডাহুক ধরার গল্প আমরা স্কুলের পড়ার বইতে অনেকেই পড়েছি। 'খটিক' 'শিকারী' পদবী পাওয়া মানুষেরা ছড়িয়ে আছেন বিহার, উত্তরপ্রদেশে। এঁদের জীবিকা পাখি শিকার। উত্তরবঙ্গে পাখি শিকারীদের বলে 'নলুয়া'। 'নিষাদ' বা ব্যাধ জাতির মানুষের কথা তো পাওয়া যায় প্রাচীন রচনাতেই। পাখি ধরার জন্যে ব্যবহার করা হয় ফাঁদ, জাল, আঠাকাঠি, বিশেষ ধরনের খাঁচা। পাখি শিকারের জন্যে তীর, গুলতি, বাঁটুল, বন্দুকের ছররা, এয়ার গান। টুপি এবং কুড়া পাখি দিয়ে পাখি শিকার করার রেওয়াজও ছিল পূর্ববঙ্গে। পোষা বাজ এবং শিকরে দিয়ে শিকার করার কথাও আমরা জানি। এমন কি রাজা-রাজরারাও বাজ ও শিকরে ব্যবহার করতেন।

'বাংলার বুলবুল, শ্যামা, কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া, বসন্ত বৌরি

মাছরাঙা, বৌ-কথা-কও, কাঠঠোকরা, চিল, ফিঙে, প্যাঁচা, হাঁড়িচাঁচা, কেশরাজ, টিয়া, চন্দনা ছাড়াও পোষার পাখি আসত বিহার, উত্তর-প্রদেশ, ওড়িশা এবং অসম থেকে। অসম থেকে প্লেনে আসত পাহাড়ি ময়না। বাকিরা ট্রেনে।

'কলকাতার পাতিপুকুরে, মেটেবুরুজে থাকতেন শিকারীরা। তাঁরা অনেকেই মুসলমান। লাসা কাঠি, ফাঁদ, জাল ফেলে পাখি ধরতেন। বিক্রি করতেন। বসিরহাট, বারাসত তখন ফাঁকা, সেখানে অনেক পাখি। পাখিরা খাঁচায় ধরা পড়ত।

'তারকবাবু বলছিলেন, মানুষ শাদা প্যাঁচাও পুষতেন। পুষতেন টুনটুনি, দুর্গা-টুনটুনি, উরতুল, চণ্ডুল। এখন বেশির ভাগই অস্ট্রেলিয়ান কেজ বার্ডস, নয়তো টিয়া, বদরি, চুনিয়া-মুনিয়া। শখে অনেকে পোষেন। কেউ কেউ একটু বড় জায়গা করে বাচ্চা তুলে দু-পয়সা করেও নিচ্ছেন—সে রোজগারও মন্দ নয়। তিনি বিদেশে পাঠিয়েছেন হলদে চন্দনা, হলদে ফুলটুসি, নীল টিয়া।

হায় সালিম আলি !

'সালিম আলি মারা গেছেন ! নেই সত্যচরণ লাহা, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর মতো মানুষ। পাখিকে জল-ছোলা খাওয়ানো, পাকা কলা বা আমের টুকরোটি মুখে ধরে দেয়ার মতো সময় আর ধৈর্য কই কচি বয়সের ! তার জন্যে কমিকস, টি. ভি, ভি. ডি.ও আর ভি.সি. আর-এর কত না উত্তেজনা অপেক্ষা করছে। আছে ক্যুইজ নামের ফাঁকি। ঢ্যা-রা-রা শব্দে চালানো প্লাস্টিক-বন্দুক, গদা, তীর-ধনুক, খেলনা-রোবট।

'পাখির সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ভালোবাসা, অরণ্য অথবা প্রকৃতিকে কাছে টানার স্বপ্ন ক্রমশ দূরগামী ছায়ামাত্র। সালিম আলি, সত্যচরণ লাহা, অমল হোম, জগদানন্দ রায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, ধনগোপাল

মুখোপাধ্যায়ের মতো একজনও লেখক আমাদের পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে নেই। অজয় হোম দীর্ঘদিন অসুস্থ, তাঁর অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলি আর দেখা যাচ্ছে না। পাখির রবে এখন আর কলকাতার রাত পোহায় না।'

বেশ লিখেছে অরিন। ছবি-ছাপায় অফসেট সৌকর্যে, অনেক জানা বিষয়ও ভাষার গুণে, রঙিন ফোটোগ্রাফ ডিসপ্লের মাহাত্ম্যে চির-নতুন মনে হতে থাকে। একটু জোরেই 'ভবিষ্যৎ'-এর এ সংখ্যাটি টেবিলে রাখলেন সতীপ্রসন্ন। ইদানীং তিনি নিয়মিত 'ভবিষ্যৎ' দেখছেন। ইনসেটে আরও একটি বক্স আইটেম ছিল, ছোট। স্ক্রিন দিয়ে সুন্দর ছেপেছে। অফসেট কত সুবিধে। ছোট ম্যাটারটির বিষয় কলকাতার পাখি। এসবকিছুই তাঁর প্রায় জানা। তবু অরিন লিখেছে, তাঁর আবিষ্কার করা প্রতিভা। সতীপ্রসন্ন পড়তে শুরু করলেন—এবং পড়ার আগে একবার ভাবলেনও অরিনকে তিনি পরিবেশ-এর জন্যে কলকাতার আকাশ করতে বলেছিলেন। তার মধ্যেও তো পাখি আসতে পারত। ডানামেলা পাখি, যা কিনা আকাশের অলঙ্কার। আবার ভবিষ্যতের পাতায় ফিরে গেলেন সতী-প্রসন্ন, অরিনের প্রতিবেদনে।

কলকাতার পাখি

'বিশিষ্ট পক্ষিবিদ আর বিষয়টি নিয়ে বহু লেখালেখি করা মানুষ অজয় হোম ভারতীয় যাদুঘরে দেয়া এক বক্তৃতায় কলকাতার পাখি সম্বন্ধে বলেছিলেন.এক সময় কলকাতার বাড়ির ছাদে বসত হাড়গিলেরা (লেপটোপটিলাস ডুবিয়াস), ইংরেজি নাম অ্যাডজুটান্ট স্টার্ক। লম্বায় (১২০-১৩০ সেমি, ৪/৫ ফুট)। এরাই কলকাতার ময়লা-আবর্জনা খেয়ে সাফ করে দিত। সেই কারণে কলকাতা কর্পোরেশনের

প্রতীক একজোড়া হাড়গিলে। এক সময় এখন যেখানে ভারতীয় যাদুঘর, তার সামনেও ঘুরে বেড়াত হাড়গিলেরা। তারা কেউ-ই আর নেই। আর চেখে পড়ে না শঙ্খচিল। হিন্দিতে যার নাম ধোবিয়া চিল, ইংরেজিতে ব্রাহমনি কাইট।

'অজয়বাবু বলেছিলেন, কাক, চিল, চড়াই, শালিক, গো-শালিক, ঝুঁট-শালিক, দেশী পাওয়ে, বুলবুলি, পায়রা, ঘুঘু, দোয়েল, কালিশামা, বসন্ত বৌরি, ফিঙে, টুনটুনি, দুর্গা-টুনটুনি,বেনে-বৌ,বাতাসী, তালকছাই, কোকিল, কাঠঠোকরা, কুকোটিয়া, নীলকণ্ঠ, মাছরাঙা, লক্ষ্মীপ্যাঁচা, কোটরে প্যাঁচা, শকুন, রাজশকুন, লগ্‌গর, শিকরে, পান-পায়রা, পানকৌড়ি, বাচকা, গো-বক এবং মরাল ছাপ দেখা যায় কলকাতায়। আর শীতে হিমালয়ের পা বা সাইবেরিয়া থেকে চিড়িয়াখানার ঝিলে নামে বেশ কিছু পরিযায়ী পখি।

'ইদানীং বেশ কয়েকবছর চিড়িয়াখানায় শীতের দিনগুলিতে নেমে আসছে না পরিযায়ী পাখির ঝাঁক। তারা দলবেঁধে নামছে সাঁতরা-গাছির বড় জলায়, কখনও ভদ্রেশ্বরে। আমাদের এক ফোটোগ্রাফার বন্ধু বলছিলেন, ফরাক্কাতেও নাকি অনেক মাইগ্রেটেড বার্ড এসে পৌঁছেছে।

'ক্রমাগত পরিবেশ দূষণ, পোড়া ডিজেল-মবিল-পেট্রোলের ধোঁয়া, গাড়ির হর্ন ও অন্যান্য শব্দ দূষণ চিড়িয়াখানায় পাখি আসার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এছাড়া আছে তাজ গ্রুপের আকাশ-চাটা হোটেল-বাড়ি তৈরির ব্যাপারটি। ঘুড়িতে বঁড়শি লাগানো চোরা-শিকারীদের আক্রমণ, আকাশ-চাটা অন্যসব বাড়ি।

কলকাতাকে ক্রমাগত বৃক্ষহীন করে কংক্রিটের জঙ্গল বানিয়ে তুলে পাখির বসার জায়গাটি, বাসা বাঁধার সুযোগটুকু নষ্ট করেছে মানুষ। সবুজ কমেছে, ময়দান ছোট হয়েছে। দূরে সরে গেছে পোকা-মাকড়, যারা অনেক পাখির নিয়মিত খাবার। কলকাতায় তাই এখন শুধু পাতিকাক আর চড়াই চোখে পড়বে। বড়জোর শালিক। অথচ বছর কয়েক আগেও কালীঘাটের কোনো কোনো বাড়ির টি. ভি অ্যানটেনায়

প্রায়ই শিস দিয়ে যেত দোয়েল, বুলবুলি। এখনও যে একেবারে আসে না তা নয়, তবে কমেছে।

'কলকাতায় আর চোখে পড়ে শকুন। কালীঘাটের কেওড়াতলা শ্মশানের কাছাকাছি আদিগঙ্গার স্রোতে ভেসে যাওয়া মৃত পশুর শব আগলাতে আগলাতে তার চলাফেরা। আর কখনও সিরিটির শ্মশানের কাছাকাছি আদিগঙ্গার পাড়ে, নরম কাদায় হাড়-মাংসের সন্ধানে।

'রিজ্ কনটিনেণ্টাল-এর মাথায় আজ থেকে বছর ছয়েক আগে একজোড়া চিলকে দেখা যেত। একটা সময় ছিল, আজ থেকে বছর কুড়ি আগেও—কালীঘাট বা চেতলায় দোকান থেকে ঠোঙায় করে আনা তেলেভাজা, জিলিপি বা হাতে রাখা শালপাতা মোড়া মাংসে ছোঁ দিত চিল। এখন বেশ কয়েকটি চিল রয়েছে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছাকাছি। আর বাঁশদ্রোণী বাজার অঞ্চলে। তারা এখনও খাবারের ঠোঙায় শিকারী যুদ্ধবিমান হয়ে নেমে আসে। কোনো ভিজে মেঘের দুপুরে ডেকে ওঠা চিলেরা বিষাদ বাড়িয়ে তোলে।

'কলকাতার কাক বাসা বাঁধে ইলেকট্রিক তারে, চড়াই ঘরের ঘুল-ঘুলিতে। শালিকও বাসা বানায় আশেপাশে। গ্রীষ্মদিনে ঘাড় বেঁকান তৃষ্ণার্ত কাক যখন একটু ঠোঁট ফাঁক করে আমাদের দিকে তাকায়, তখন তা হয়ে ওঠে ছবির বিষয়। জ্যোতিষীর সঙ্গে খাঁচায় খাঁচায় ঘোরা ভাগ্যের পরচা খোলা টিয়ারা তো এই কলকাতার ফুটপাথে হামেশাই চোখে পড়ে। নয়তো রবিবারের ময়দানে, ঘাসের ওপর খরিদ্দারের প্রত্যাশায়।

'গরমের শেষ বিকেলে কলকাতার রাস্তার গঙ্গাজলের ফোয়ারায় চান করতে দেখেছি শালিকের ঝাঁককে। চড়াইরা দলবেঁধে ধুলোর পাউডার মেখে মেখে মেক-আপ সেরে নেয় ঐ সময়েই। সুরেন ব্যানার্জী রোডে একজোড়া রাজহাঁস রাস্তা পেরতে গিয়ে অনেক সময়েই ট্রাফিক আটকে দেয়। আর একজোড়া রাজহাঁস আছে কিরণশঙ্কর রায়ের বাড়ি। তারা নতুন মানুষ দেখলেই তাড়া করে। রয়েছে কিছু হাঁস-মুরগী, পায়রা, খাঁচাবন্দী টিয়া-চন্দনা-ময়না। তাদের কথা

একটু বিশদে অন্য একটি লেখায় বলেছি।

'ইদানীং কলকাতার উত্তরে এবং দক্ষিণে ফুটপাথ-বাগান করার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। হকার আটকাতে বা ফুল ফোটাতে এইসব বাগান তাদের নিজস্ব ভূমিকায় উজ্জ্বল। কোনো কোনো ফুটপাথে ফুলের গল্প শোনান বাগান আছে। কোনো কোনো বাগান আছে বদরি, চুনিয়া-মুনিয়া, টিয়া, লাভবার্ড। গত দশ বারো বছর ধরে ব্যাপারটি গড়ে উঠেছে। কালীঘাট, রাসবিহারী, বেলতলা, বিবেকানন্দ রোড, নিমতলা অঞ্চলে এমন ফুটপাথ চোখে পড়ে।

'কলকাতার আকাশে এই দশ বছর দশেক আগেও উড়ে যেত লক্ষ্মী প্যাঁচা। আর পরিযায়ী পাখিরা বহুদূর থেকে দক্ষিণের আলিপুর চিড়িয়াখানার জলে নামার জন্যে সার বেঁধে উড়ে যেত কালীঘাট, চেতলা আলিপুরের আকাশ দিয়ে।

'অজয় হোম কিছুদিন আগে কলকাতায় পাখি প্রসঙ্গে একটি কাগজে লিখেছিলেন, তিনি কলকাতার যে সব বাড়ির বাগানে আতা গাছ আছে, সেখানে বেনে-বৌ দেখেছেন। তাল চড়াই, শকুন দেখেছেন বালিগঞ্জ পার্কসার্কাস অঞ্চলে। এইখানেই তাঁর চোখে পড়েছে দেশী পাওয়ে, বুলবুল, ঘুঘু, কালিশামা, গো-শালিক, দোয়েল। বালীগঞ্জ, পার্কসার্কাস এলাকায় অবশ্য কিছু বড় গাছ আছে, কিন্তু এই সব পাখিরা আজও পরিবেশ এবং শব্দ-দূষণ সহ্য করে থাকতে পারছে কিনা তা নিয়ে সংশয় থাকে।

চিড়িয়াখানার পক্ষি-সংসার

'কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায় দেশী-বিদেশী মিলিয়ে আছে প্রায় ১০০ জাতের পাখি—এরা চিড়িয়াখানার স্থায়ী বাসিন্দা। এছাড়া ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চিড়িয়াখানার বড় জলাটিতে উড়ে আসে নাকতা, ছোট সরাল, বড় সরাল, নীল ডানা

আর সূচীপুচ্ছ হাঁসেরা। সংখ্যায় এরা প্রায় সাত আট হাজার। বছর দশেক আগেও হাজার বারো পরিযায়ী পাখি আসত উড়ে। তারও দশ বছর আগে চোদ্দ/পনের হাজার। তখন এদের আসার সময়টাও ছিল কিছু আগে—জানুয়ারি মাসে। এই পাখিদের ভেতর শতকরা ৬০টি হিমালয়ের পা থেকে উড়ে আসে। ৪০টি সাইবেরিয়ার বরফ আর হিম ডানায় মেখে। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বেরুনোর পর বাচ্চাদের নিয়ে আসে মা-রা, সঙ্গে বয়স্ক পুরুষ হাঁসেরাও। নাকতা, ছোট আর বড় সরাল আসে হিমালয়ের পা থেকে। সাইবেরিয়ার শীতলতা লেগে থাকে নীল ডানা আর সূচীপুচ্ছর পালকে। চিড়িয়াখানার মায়া কাটিয়ে এদের ফেরার পালা এপ্রিল মাসে।

'বছর দশেক আগেও চিড়িয়াখানার ভোরের বাতাস আর কুয়াশা ছিঁড়ে যেত এদের ডানার শব্দে ওড়ন-পর্বে, কলকণ্ঠে। আজ আর সে দিন নেই।

'কেন আসে না আর হাঁসেরা ? এমন প্রশ্ন করলে বিশেষজ্ঞরা উত্তর দেন—মূলত তিনটি কারণ রয়েছে এর পেছনে। (১) সাঁতরাগাছিতে শীতে নামার মতো এরা একটি জলাশয় পেয়ে গেছে। (২) শব্দ-দূষণ, ভীষণভাবে বেড়েছে গাড়ি-ঘোড়া, শব্দের নাগরিক পাঁচিল তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে। (৩) সমস্ত পৃথিবী জুড়েই বন্যপ্রাণী, পাখির সামনে একটি অস্তিত্বের সংকট দেখা যাচ্ছে।

'কলকাতার চিড়িখানায় ১৯৮৯ সালে বন্দী অবস্থায় বাচ্চা দিয়েছে কাকাতুয়া, ভুটান গ্রে-পিকক, স্পুনবিল, পেণ্টেডস্টর্ক, ব্রাহামা ফাউল। খাঁচার মধ্যে বা ঘেরা জায়গায় বাচ্চা না হলে নতুন করে পাখি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় সব পাখি-জীবজন্তুর ডিলার 'মাল'-এর অভাবে বসে গেছেন। পাখিঅলাদের নতুন কোনো লাইসেন্স সরকার দিচ্ছে না। রিনিউ করিয়ে কাজ করাও অনেক ঝামেলা। ফলে পেশা পরিবর্তন হচ্ছে।

'একমাত্র ভরসা এদেশের বা বিদেশের চিড়িয়াখানার সঙ্গে পাখি, জীবজন্তুর বিনিময়। তাও বা সব সময় হয় কই।

'আমরা অনেকেই জানি, রাজেন মল্লিক, ওয়াজেদ আলি শা, বাকল্যাণ্ড আর সুইংলার সাহেবের পশু-পাখি সংগ্রহ নিয়ে গড়ে উঠেছিল আলিপুর চিড়িয়াখানার একটি অংশ। এখন সে রকম সংগ্রাহক নেই, যিনি তাঁর সংগ্রহ নিয়ে জমা দেবেন পশুশালায়।

তবু ভালোয়-মন্দয় মিলিয়ে চিড়িয়াখানার পাখিরা আছে। আর রয়েছে তাদের বিচিত্র খাদ্যাভ্যাস। মাংসের কিমা, পিঁপড়ের ডিম, ছোলা-বাদাম ভেজানো, মধু, মাছ, হাফবয়েল মুরগীর ডিম, কপিপাতা, লেটুস শাক, ছাতু, ফড়িং, পোকা-মাকড়, নানাকরম ফল—সব মিলিয়ে তাদের দৈনিক মেনু।'

লেখা শেষে বারো পয়েন্ট ইটালিকস-এ অ. রা.—মানে অরিন রাহা।

দুটো স্টোরি মিলিয়ে একটা প্যাকেজের জন্যে অরিন প্রায় হাজার টাকা পাবে। কিভাবে লেখক পাবেন তিনি! ভাবতে ভাবতে ম্লান ডুমের আলোয় সতীপ্রসন্নর সবচেয়ে বেশি রাগ এলো নিজের ওপর।—আসলে আমিই ব্যর্থ। কিছুই পারিনি। একজন ব্যর্থ মানুষ। ব্যর্থ সম্পাদক। ব্যর্থ প্রকাশক হিসেবেও। শুধু নিজের সঙ্গে নিজেই প্রতারণা করে গেছি। কিছুই হলো না।'

এই বর্ষাতেও, নাকি প্রাক-শরতে অরিন বারে বারে শীতের প্রসঙ্গ এনেছে। শীত মানেই তো পাখি: ডানা নেড়ে নেড়ে তাদের উড়ে আসা আমাদের এই শহরে, আশেপাশে। সতীপ্রসন্নর মনে হলো ইচ্ছে করেই এনেছে অরিন শীত-প্রসঙ্গ।

এক গাদা প্রুফ পড়ে আছে। সে দিকে তাকিয়ে হাই উঠল সতীপ্রসন্নর। আজই প্রিন্ট অর্ডার না দিলে নয়। কাগজ আটকে যাবে। তারপর পাতার নম্বর, ফর্মা, লেখকের নাম মিলিয়ে মিলিয়ে সূচীপত্র তৈরি করে ফেলা। সেটাও যথেষ্ট বোরিং। এই একঘেয়ে, থ্যাঙ্কলেস জব করতে করতে সতীপ্রসন্ন ইদানীং প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েন, শরীরে এবং মনে।

অরিন যা লিখেছে, এসবই তো 'পরিবেশ'-এর মলাট-কাহিনী হতে পারত। তিনিও তো খুব যত্ন করেই ছাপতেন। এবং মলাটে অরিনের নাম। রঙিন অক্ষরে, আর তাঁর কাগজের মলাটও তো ছাপা হয় অফসেটে। ফোর কালার অফসেট।

অবশ্য ভেতরে এত ভালো কালার ডিসপ্লে, কাট আউট করে পাখির উড়ন্ত রঙিন ডানার ভেতর ম্যাটার ঢুকিয়ে কায়দা করার টেকনোলজি তাঁর নেই। এখানেই হার। সতীপ্রসন্ন টেবিল থেকে 'ভবিষ্যৎ' তুলে নিলেন। জোরে জোরে পাতা উল্টে উল্টে দেখলেন। বিড় বিড় করে কি যেন বললেন। তারপর আবার রেখে দিলেন টেবিলে। আবার হাতে নিলেন। তারপর সরিয়ে রাখলেন একটু দূরে, হাতের বাইরে।

গোটা শরীর মনে বিষাদ ছড়িয়ে পড়লে হাত-পা সচল থাকতে চায় না! ঘুম জড়িয়ে ধরে। এখনও কি তাই হচ্ছে? হেঁটে কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে গিয়ে বসন্ত কেবিনে এক কাপ চা খাবেন? যদি সেখানে গণেশ পাইনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! দু একটা কথা হবে এই সুভদ্র, বড় মাপের শিল্পীটির সঙ্গে। না হলে অন্য কেউ থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে দু' একটা কথা, মত বিনিময়।

গেঞ্জির ওপর খাদির মোটা শার্ট চাপাতে চাপাতে সতীপ্রসন্ন পর পর দুবার গলা ছেড়ে ডেকে উঠলেন—যতীন! যতীন আছ?

চৌদ্দ

অনেকটা প্রাচীন, যে ফ্রিজ জেগে উঠলে রীতিমতো শব্দ ভাসে বাতাসে, তার যান্ত্রিক ধ্বনি শুনতে শুনতে সুধাপ্রসন্ন টের পেলেন এবার হয়ত বর্ষা বিদায় নেবে। সেই জলভরা গম্ভীর মেঘেরা, যারা বিনা নোটিশে যখন-তখন ভেঙে পড়তে পারে, তারা ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। খুঁজলে পি. এন মিত্রর ইট খোলার পাশে রুপোলি

কাশগুচ্ছের শোভা চোখে পড়তে পারে। হলুদ বোঁটাঅলা দুধ শাদা শিউলিরা আর কদিন পরই সবুজ ঘাসে অক্লেশে ঝরে যাবে, প্রাকৃতিক নিয়মে। এভাবেই ঋতু বদলায়।

সুধাপ্রসন্নর মনে পড়ল শিউলিকে হিন্দিতে বলে হর-শিঙ্গার। যা দিয়ে শিব সাজেন। অন্তত মানে মোতাবেক।

আকাশে এখন রোদের সার্চলাইট। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। এরকম রোদে ছোট বেলায় ঘুরলে জ্বর আসত। আর জমা জলের লাগোয়া ঘাসবনে গঙ্গাফড়িং লাফিয়ে বেড়ায় এখনই। তাদের পেছন পেছন শিকারী ব্যাং। পুকুরে বিলে নবীন, লাল লাল, ঝাঁক-বাঁধা বাচ্চাদের আগলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মা-শোল মাছ। তার পুরুষ্টু কালচে শরীরে সবুজাভ জল এবং মেঘের ছায়া লেগে থাকে।

দেশের বাড়িতে ঘাসফড়িং ধরে শিশিতে রাখতেন সতীপ্রসন্ন। ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতিপাঠের দিকে ওর নজর। প্রকৃতির পাঠ-শালায় নিত্য নতুন বর্ণমালা পড়ে ফেলার চেষ্টা।

ফ্রিজের গম্ভীর শব্দ বাতাসে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে মিশে যাচ্ছিল। সকাল থেকে টানা তিন চার ঘণ্টা লোডশেডিংয়ের পর বিদ্যুৎ এসেছে। এই রবিবারের সকালে বোকা বাক্সের সামনে একই নীতিশ ভরদ্বাজ কখনও শ্রীকৃষ্ণ কখনও বা টুথপেস্টের ফেনায়িত বিজ্ঞাপনের সুশ্রী যুবা হয়ে যাচ্ছিল—কয়েক মিনিটের ব্যবধানে। 'মহাভারত'-এর আগে কারেন্ট না এলে মেজাজ তেতো হয়ে যায়। সারা ভারতবর্ষের মানচিত্র জুড়ে এমনই মহাকাব্যের জ্বর।

রবি বর্মার আঁকা ছবিই তো, তার থেকে উঠে আসা যাবতীয় চরিত্র—অন্তত খবরের কাগজের দু একটি লেখা, সমীক্ষা থেকে এমনটি মনে হয়েছে সুধাপ্রসন্নর। সেই মহাভারতীয় ক্রেজ ছিল একটু আগেই গোটা বাড়ি জুড়ে। এমনকি দীপেশও, চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে।

ঘরের জানলা, খোলা খড়খড়ির পর এক মানুষ সমান পাঁচিল। তার গায়ে সবুজ ভেলভেট রং শ্যাওলার জামা। তার ওপর একটা বড়

কালো প্রজাপতি জ্যান্ত ব্রোচ হয়ে বসেছিল। একটি হলুদ-কালো ডোরাকাটা বেড়াল শব্দহীন পায়ে পেরিয়ে গেল এবাড়ির জন্যে তৈরি করা উঁচু সীমানা। প্রজাপতি উড়ে গেলে দোয়েল এসে বসে গান শোনাল। এক দুই তিন—তিনটে শিস—গুনে গুনে। পাখিদেরও মাত্রাবোধ আছে। সতীপ্রসন্ন দেখলে আরও মজা পেত।

চিঠির বিষয় নোটস, খোলা রয়েছে সামনে। সুধাপ্রসন্ন দেখতে পাচ্ছেন শিস দেয়া দোয়েল এখন মশা ধরছে।

পাঁচিলের পর সরু পিচ বাঁধানো রাস্তা। তারপর বাড়ি! গুল কারখানা। গুল-কয়লার ব্যবসা করে দুই ভাই মোটর সাইকেল কিনেছে। সঙ্গে ব্রয়লার মুরগী—মাংস-পাখি! পনের দিন, একমাস পর পাইকার এসে পাখি নিয়ে যায়। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হেঁট মুণ্ড, উর্ধ্বপদ, শীর্ষাসন করা শাদা পালক, লাল ঝুঁটি। ডানা ঝাপটানোর উপায় নেই। ভয়ে-আতঙ্কে চোখ সবারই প্রায় বন্ধ। এরা করুণাময়ী বাজার, সেনহাটি বাজার, টালিগঞ্জ বাজার—এমন কি সাদার্ন মার্কেট, শখের বাজার, কালীঘাট বাজার, বাস্তুহারা বাজার চলে যাবে।

করুণাময়ী বাজারে বঁটিতে প্রথমে গলা, তারপর দু পা কাটার পর, চোখ ওল্টানো ছিন্ন ব্রয়লার-মুণ্ডুর ঠোঁটে জল দিতে দেখেছেন মুরগী-অলাকে। মুণ্ডহীন কেঁপে ওঠা গা থেকে পালক ছাড়ানো আস্ত মাংসকে মনে হয় যেন বা মানব শিশু। তারপর পেট ফাঁসিয়ে তার ভেতর থেকে স্টমাক, মেটে, নাড়ি-ভুঁড়ি, পিত্তি বের করে এনে ধুয়ে কেটে পরিষ্কার করার মুহূর্তেও মুরগী-হৃদয় নাচে—ধুক ধুক। ধুক ধুক। লিভারের আঁশ নখ দিয়ে তুলে তুলে খাবার উপযোগী করে দেয় মাংসঅলা।

এসবই সতীপ্রসন্ন বা অন্যান্য নাগরিকদের মুখস্থ। শালপাতার বদলে ইদানীং পলিপ্যাকে মাংস। কালচে রক্ত শুকিয়ে থাকে সিমেণ্টর বেদী এবং বঁটির গায়ে। শাদা পালক নাড়ি-ভুঁড়ির ওপর ভিন ভিনে নীল মাছি। মুণ্ডুটি কুটে চোখ দুটো উপড়ে বার করে

নিয়ে পলিপ্যাকে দিয়ে দেয়া। মাথা চিবনোর কথা ভাবলে জিভে জল কাটে। এবং এই বয়েসেও।

সাইকেল বন্দী পাখিরা মাংস হতে চলে যাওয়ার সময় বোধহয় একবার ডেকে উঠল। আর এ রবিবার 'মহাভারত' শেষ হয়ে যাওয়ার পর মেনতুর দোকানের সামনে আড্ডা দেয়া কোনো যুবজন তারই সমবয়েসকে বি. আর চোপড়ার শেখানো ভাষায় বলে উঠল—আইয়ে, বিরাজিয়ে।

এটুকু শুনতে পেলেন সুধাপ্রসন্ন। তারপর বোধহয় আশীর্বাদের মুদ্রায় আয়ুষ্মান ভব। বিজয়ী ভব, বলল কেউ। নাকি বলল না! হয়ত শ্রবণে কোনো ভুল আছে। তবু এটাই তো এখন কালচার—পিতাশ্রী, মাতাশ্রী, তাতশ্রী, মামাশ্রী, ভ্রাতাশ্রী। আমরা সবাই চারপাশের এই অপার শ্রীহীনতার মধ্যে কেমন যেন শ্রীমান হয়ে উঠতে পেরেছি, অন্তত এটুকু সেলুলয়েড-বোকামিতে।

সাইকেল রিকশা চলে যায় হর্ন দিতে দিতে। পেছনে অটো। তারপর লরি। দরজার ফ্রেমে দাঁড়ালে কবরখানার পাশে যে বাঁশ ঝোপ চোখে পড়ে, তারা কোন ম্যাজিকে রাত এলে চীনা ছবি হয়ে যায়, জোনাকির অজস্র আলোকবিন্দু বুকে নিয়ে। এমন কি কোনো মেঘলা আকাশের নিচেও এই ঝাড়ালো সবুজ বাঁশগাছেরা সিল্কের ওপর ছাপা চীনা পেইনটিং হয়ে যেতে পারে অবলীলায়।

দরজায় বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। খিস্তির ফোয়ারা ছুটে আসে মেনতুর দোকানের সামনে আড্ডার জটলা থেকে। আদি রসাত্মক আলগা বাক্য, অজস্র সিগারেটের ধোঁয়া।

ঘরে ফিরে এসে চৌকির ওপর আধশোয়া হতে হতে তিনি যে আকাশ, যে রোদ পেলেন, তা তো আলাদা করে তাঁর মতন কিছু নয়। সপ্তাহের সব দিনই তো তাঁর রবিবার, রিটায়ারমেণ্টের গড়িমসি। করছি করব। রবিবার তো শুধু উপভোগ্য অফিস-আদালত-ব্যবসাস্থল যাত্রী মানুষদের কাছে। তাঁর এই অনন্ত ছুটির মধ্যে আলাদাভাবে এই সাপ্তাহিক ছুটির কোনো মাত্রা নেই।

হুগলী জেলার রাজহাট গ্রামে ময়ূরের ডিম পাড়ার জায়গা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেখানকার দশটি ইটভাটার মালিকেরা ইট পোড়ানোর জন্যে যেখানে-সেখানে মাটি কেটে ফেলে, গ্রামের ঝোপঝাড় নষ্ট করে ময়ূরের ডিম পাড়ার জায়গা মুছে দিচ্ছে। এইসব ডিম সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করছে স্থানীয় কিছু মানুষ। আজও সেখানে ময়ূরালয় হয়নি, অথচ ওখানে বেশ কয়েকটি ময়ূর আছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্যোক্তারা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। কিন্তু এ পাখি তো ভারতের জাতীয় পক্ষি—সবাই সে কথা জানে।

কাগজে ছোট্ট একটি খবর দেখেছিলেন। তা ধরেই চিঠি। এরকম বহু ইন্টারেস্টিং কাটিংস তাঁর মোটা ডায়েরির পাতায় আঠা দিয়ে সাঁটানো। যেমন গত তিরিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম তুষার চিতা বন্দী অবস্থায় বাচ্চা দিল দার্জিলিংয়ের চিড়িয়াখানায়, গোটা পৃথিবীতে এটি একটি রেকর্ড। আবার দুর্লভ প্রজাতির ক্ষুদে তিমি পিগমি স্পার্ম মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে আন্দামান উপকূলে। ৩ মিটার পঁচিশ সেন্টিমিটার লম্বা এই পিগমি স্পার্ম আছে বিশ্বের খুব কম সমুদ্রাঞ্চলে।

এরই সঙ্গে আঠারো কোটি বছর আগেকার কচ্ছপ ইন্দো-চেলিশ স্প্যাচুলাটার ফসিল, যা ছিল স্বাদু জলের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রাচীনতম, পাওয়া গেছে প্রাণহিতা গোদাবরী উপত্যকায় একটি চুনা পাথরের আস্তরণের ভেতর থেকে—তার খবরও।

সোভিয়েত রাশিয়ায় বাথটবে, সুইমিংপুলে জন্মানো জলশিশুদের কথাও তাঁর কাটিংস, ক্লিপিংস ফাইলে। ও দেশে প্রথম জলশিশুর জন্ম হয়েছিল ১৯৭২ সালে। এখন এরকম শিশুর সংখ্যা এক হাজার। এই রকম জন্মের ফলে মায়েদের কষ্ট কমে, বাচ্চারা হয় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। তাদের মানসিক এবং শারীরিক বিকাশ ঘটে দ্রুত।

রান্নাঘর থেকে নারকেল পাতা পোড়া গন্ধ মিশে যাচ্ছে বাতাসে। অপরাজিতা বা মনোরমা কেউ একজন সিলিণ্ডারের গ্যাস বাঁচাতে শলা বের করে নেয়া নারকেল পাতায় কোনো রান্না চাপিয়েছেন। প্রাচীন

ফ্রিজ মাঝে মাঝেই নিজস্ব গর্জন পৌঁছে দিচ্ছে কানে। সুধাপ্রসন্ন রাজারহাটের ময়ূরদের কথা, তাদের ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির কথা ভাবছিলেন। চিঠি ছাপা হলে সমস্যার সমাধান কি তেমনভাবে হবে? নাকি আদৌ কারোরই কানে জল যাবে না?

প্রথম প্যারাটা কেমনভাবে করা যায় ভাবতে ভাবতে আবারও আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর যেন ঘুম এলো। ঘুম-ঢুলুনি।

পনের

বর্ষার বাজার যাওয়ার এমনিই অনেক অসুবিধে। বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে কাদা হয়ে থাকা পথ, জিনিসপত্র আগুন দাম। কমপালসারি ছাতা বহন, সেই ছাতা মাথার ওপর মেলে ধরে, থলি নিয়ে সার্কাসের ট্রাপিজের কায়দায় হাঁটা। আর কলকাতার বা তার গা-লাগোয়া শহরগুলির দু' একটি বাদ দিয়ে সব বাজারই তো খাটাল বিশেষ, বর্ষার দিনে। পচা পাতা-পুতি, আনাজ-তরকারি, কাঁঠালের ভূতি, মাছের কানকো পোটকা আঁশে সে এক দুর্গন্ধ রৌরব বিশেষ। মানুষ এ সবই তার জীবনের প্রাত্যহিকতায় মিশিয়ে মেনে নিয়েছে। মেনে নেয়া, মানিয়ে নেয়া আশির দশকের নতুন ফেনোমেনা!

পেঁপে, পটোল, চ্যাঁড়স, উচ্ছে, মাদ্রাজি ওল, কচু, মান, মহার্ঘ কাঁকরোল-এই তো এখন কয়েকটি হাতগোনা তরকারি। বাঁধাকপি তো আরও বেশি দাম। মাছও ক্রমশ বলগাহীন। বাঙালি মধ্যবিত্ত খাবে কি? তার পুষ্টি, মেধা, পেটভরানো হবে কেমন করে?

পিঠে-পায়েস, রসবড়া, তালক্ষীর, তালের বড়া, ক্ষীর-রাবড়ি-এ সবই তো দুষ্প্রাপ্য অ্যান্টিকপ্রায়, কোনো মহিলা ম্যাগাজিনের কভার স্টোরির বিষয়। চালের গুঁড়ো, ক্ষীর-নারকেল দিয়ে পাটিসাপটা, দুধপুলি, রসপুলি, গোকুল পিঠে, আশকে, ভাপা পুলি, সেদ্ধ পিঠে, সবই রান্নার বিচিত্রবর্ণ বইয়ের পাতাতেই শুধু ইদানীং। ফাস্ট ফুড—

রোল, চাওমিনের দাপটে সাবেকি ঢঙে খাবার— ঘুগনি, কচুরি, মাছের চপ, বাড়ির এইসব কুটিরশিল্প নিরুদ্দেশ স্পিসিস।

সতীপ্রসন্ন কতদিন স্বাদস মাছ খান না, আরও কত কত দিন খলসে! বড়ি বেগুন খলসে মাছ দিয়ে ঝোলের স্মৃতি মিউজিয়াম পিস হয়ে গেল নাকি? মাঠে ব্যাপক কীটনাশক এইসব মাছকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূরে পাঠিয়েছে। অথচ ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফের প্রচণ্ড কড়া-কড়িতেও বাজারে বাজারে কচ্ছপের মাংস, ডিম। শেয়ালদার কাছাকাছি মহাত্মা গান্ধী রোডের ওপর স্তূপ করা খোলাবন্দী ওল্টানো মাংসেরা। বোধহয় কেউ-ই দেখার নেই।

ছাতা থলি হাত বদল করে করে এগনো বাড়ির পথে। ফ্রিজে ঢুকবে বলে ব্যাগের ভার কিন্তু বেশি। একটু তেল-মশলাও আছে। আকাশের রং দেখে বোঝার উপায় নেই বেলা কত হলো। মেঘের আড়ালে গোপনে তা বেড়েছে। অথচ ঋতুর হিসেবে তো এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। করুণাময়ী কালীবাড়িতে পুজো দেয়ার জন্যে যাচ্ছিলেন কেউ কেউ। এঁকেবেঁকে, ভিড় কাটিয়ে ছুটে যাচ্ছিল দুঃসাহসী অটোরিকশা।

বাড়ি ঢোকার আগে, ডানদিকে ছায়ালো নিমের নিচে মেনতু ভাণ্ডারীর দোকানে তালা দেখলেন সতীপ্রসন্ন। টিনের শেডটি নামানো। বুঝতে পারলেন মেনতু হয় বেহালা চৌরাস্তা, নয়তো দেশে গেছে। বিবাহ সিজনে নরসুন্দর হিসেবে দু একটি অনুষ্ঠানে তার ডাক পড়ে। মেনতু বাবার আমলের পুরনো যজমান ছাড়ে নি। রোজগার মন্দ নয়। বেহালা চৌরাস্তা থেকে তার দোকানের মাল আসে।

গেট ঠেলে ভেতরে ঢোকার আগে দীপেশকে ওদিক থেকে আসতে দেখলেন। বাইরে যাবে। তার সামনে আসাতে বাতাসে চন্দনের গন্ধ। একটু আগে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরেছে। খুব ফ্রেশ লাগছে। সরু পা আলিগড়ি, তার ওপর হাঁটু ঝুলের পাঞ্জাবি, ঢোলা হাতা গোল গলা, লক্ষ্ণৌ কাটিং। দীর্ঘ, সুপুরুষ। চওড়া বুকের ছাতি।

ছাতা নিলি না, আকাশে মেঘ আছে। এ বাড়িতে থাকা পরবর্তী প্রজন্মের একমাত্র প্রতিনিধিটিকে সাবধান করতে চাইলেন সতীপ্রসন্ন।

দীপেশ আলতো করে ঘাড় নাড়ল—অস্ফুটে লাগবে না শব্দটি ছড়ালো বাতাসে।

বর্ষায়, এরকম মেঘলা আঁধারে কোনো মানুষ যদি একলা মুছে যায়, তার জন্যে মন খারাপ হয়েই থাকে। কখন ফিরবে কোনো ঠিক নেই। ভাত খেয়ে বেরিয়েছে কিনা, তাই বা কে জানে! কি এক ঘোরে রয়েছে ইদানীং তাঁর সরোদিয়া ভাইপোটি। সব সৃষ্টিশীল মানুষই বোধহয় প্রায় সময়েই এমন স্বভাব-ঘোরে।

ছাতা থলি সামলে আগড় পেরিয়ে কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস আর বৃষ্টি। দীপেশ কি বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে? কিংবা কোনো অটোয় সওয়ার হয়ে গন্তব্যে? নাকি একলা ভিজছে—যেমন ভিজে যায় দুঃখী, একলা মানুষ।

বর্ষালু বাতাস বৃষ্টিকে এদিক ওদিক করে দিচ্ছিল। রান্নাঘরের ভেতর থলি রাখতে রাখতে সতীপ্রসন্ন সাঁতলা ভাজা মুড়ি খেতে চাইলেন। সামান্য গরম তেলে মুড়ি, পোস্ত, পেঁয়াজ, লংকা ভেজে মুচমুচে মুখরোচক—এই বর্ষাদিনে। মনোরমা নাকি অপরাজিতা, কাকে জানাবেন মনের ইচ্ছেটি? নিজেই বুঝতে পারলেন না ঠিক মতো। এই দুই নারী তাঁকে নানাভাবেই ঘিরে রেখেছেন জীবনের উষ্ণতায়, রূপে-রসে, বর্ণে-গন্ধে।

আপাত-বিষাদের মধ্যে, নানান হেরে যাওয়ার ঘোরে সাঁতলা ভাজা গরম মুড়ি আসবে একবাটি—এটুকুই তাঁর কাছে বেঁচে থাকার উত্তেজনা। এই বর্ষায় রসুন, কাঁচা তেল, চাল ভাজা, ছোলা ভাজা চিবনোও কম মোহময় নয়। কিন্তু আজ সাঁতলা ভাজাতেই উত্তেজক মশলা ছিল।

মুড়ির বাটি হাতে মনোরমা নয়, অপরাজিতাই এই মেঘলা আলো ভেঙে তাঁর স্টাডিতে এলেন!—দাদাকে, বলতে বলতে, অপরাজিতার

হাত থেকে মুড়ির বাটি নিতে নিতে হাতে উষ্ণতার স্পর্শে সচকিত হয়ে, এটুকু শরীরের নয়, কারণ বয়েস হয়েছে—মুড়িতে যে উত্তাপ তারই ছোঁয়াটুকু হাতে। সামান্য ঠোঁট ফাঁক করে হাসির রহস্যে অপরাজিতার চলে যাওয়া। এবং রান্নাঘরের হলুদ-মশলা লাগা আঁচলটি শরীর বেড়িয়ে টেনে নেয়ার ভঙ্গিমায় আজও সে যে কোনো নারী—যেমনটি সতীপ্রসন্নর যৌবনে নানান ওঠা-পড়ায়।

মুড়ির বাটি হাতে তাঁর মনে পড়ল বহুদিন আগে বাড়ির সামনের গাছে আসা বেনে-বৌ পাখিটিকে। সেই হলুদে কি যেন এক ঝলক ছিল। আজ অনেকদিন পর মুড়ির বাটি, বর্ষণ, হলুদমাখা আঁচলের ঝলক—সব মিলিয়ে যেন বা বেনে-বৌয়ের উড়ে যাওয়া। সতীপ্রসন্ন সুখ পেলেন। বাইরে বৃষ্টি-বাতাস বর্ষার মেজাজ বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

একটু পরে জল নিয়ে ঢুকলেন মনোরমা। তখন মুড়ি শেষ হয় নি সতীপ্রসন্নর। এবং এই বর্ষায় কিভাবে কলেজ স্ট্রিট পৌঁছবেন, আর সেখান থেকে আবারও ফিরে আসবেন ভিড়, কাদা, জল, জ্যাম পেরিয়ে—ভাবতে ভাবতে একঢোঁক জল খেলেন।

দোতলায় হরবনস মেহেতার ভি. ডি.ও ক্যাসেটে কোনো নতুন মারদাঙ্গা, নাচা-গানা। আর একতলায় পুরনো ফ্রিজের ঝংকার। দাঁতের ফাঁকে পোস্তর দানা থাকলে জিভের নাড়াচাড়ায় তাকে বের করে না আনা পর্যন্ত অস্বস্তিতে ছিলেন সতীপ্রসন্ন। সেটুকু বিলম্বিত হতে থাকল, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে।

সকালে মাইতি পাড়া দিয়ে হেঁটে আসার সময় সরু সিমেন্ট বাঁধানো গলি পেরিয়ে আসতে আসতে বাঁ-দিকে সতীপ্রসন্ন যে ভরাট পুকুরটিকে দেখেছিলেন, এই রাতে এগারোটায় পাম্পের শব্দে, উঠে আসা জলের উচ্ছ্বাসে, চাঁদের আলোয়, ফেনায়িত জলস্রোতে, সেখানে যেন বা বন্যার মায়া ছিল। সরু গলিটি পেরিয়ে এলে যে ফালি মাঠ, তার গায়ে একটি একক গাছ, নেহাতই গোরু বাঁধার খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে। এইমাঠের ওপর, কাছাকাছি যতগুলো কাঁচা বাড়ি, সবই ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের। তাঁদের অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থান ক্রমাগত নিম্নাভিসারী।

ডিজেল-পাম্পের শব্দে, চাঁদের আলোয়, উঠে আসা জলের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে পারিপার্শ্বিক জেগে উঠেছিল। অথচ তাদের কিছু করার ছিল না।

একটু দূরে, মাঠ পেরিয়ে পিচ রাস্তায় উঠে এলে বাড়ি আর গাছের ছায়ার অন্ধকারে দাঁড়ানো মাটাডোর ভ্যান, পাশে ভাড়ার ট্যাক্সি। সবাই এই অদ্ভুত আঁধারে স্থির। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। এই ভাদ্রে বর্ষা শেষে, শরতের প্রস্তুতি নেয়া প্রকৃতিতে এমন আকাশ নিয়মমতো প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে।

যে গরীব মুসলমানেরা এখানে মূলত কাঁচা ঘরে থাকেন, তাঁদের বাড়ির বালিকা, বিবাহিত নারীরা অনেক সময়েই পাশাপাশি হিন্দু বাড়িগুলিতে বাসন মেজে, নয়ত এটা-ওটা করে, গোরু ছাগল হাঁস পুষে সামান্য আর্থিক সুরাহাটুকু করার অবিরত চেষ্টা চালান। কোনো রকমে দিন যায়!

পুরুষরা কেউই চাকরি করে না প্রায়। বাজারে মাছ-তরকারি নিয়ে বসা। হালফিল দু একজন অটো-চালক।

কয়েকটি ছায়া, টর্চের আলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল ডোবার পাড়ে। রাজনৈতিক ক্ষমতা কখনও মানুষকে অন্ধ করে দেয়। আর সেই অন্ধ তাড়নায়, টাকার লোভে, পাম্পের টানে পুকুরের জল উপচে পড়ছিল জমিতে। ভাদ্রের নিয়মে বুড়ো, হলুদ, নিমপাতা খসে যাচ্ছিল গাছ থেকে। চাঁদের ফেলে দেয়া জ্যোৎস্নায় কোনো কার্পণ্য ছিল না। শুধু কয়েকজন মানুষ পুকুর ভরাট করে জমি বিক্রির কথা ভাবছিল। এই উদ্যোগটুকুর দালালি থেকে পকেট ভর্তির ভালো ব্যবস্থাই হবে। এমন একটি অঙ্ক ছিল।

কাঁচা বাড়িয় মুসলমান বাসিন্দারা, যাঁরা এমনিতেই সংখ্যালঘুর স্বাভাবিক সংস্কারে নিরাপত্তা বোধের অভাবে, কিছুটা ভয়েই এই জল উঠে আসার বিরুদ্ধে তেমন কিছু বলতে পারেন নি। অথচ এটুকু থেকেই তাঁদের প্রাত্যহিক বাসন মাজা, স্নান, কাপড় কাচা। ঘর-পোষা হাঁসেদের ভেসে থাকা। শব্দে, চাপা গুঞ্জনে জল তুলে ফেলার যে প্রস্তুতি, তাকে বাধা দেয়ার মতো মানসিক বা শারীরিক ক্ষমতা তখনই কারও ছিল না। শুধু শব্দ করে করে পাম্প বেজে চলছিল।

অথচ ভোর হয়ে এলে বেড়াতে যাওয়ার ফাঁকে সতীপ্রসন্ন ঐ কমে আসা পুকুরের জল দেখতে পেলেন না। কারণ তাঁর পথ ছিল ভিন্ন। ফিরে এসে বাড়ির গেটে, মেনতুর দোকানের সামনে, অপেক্ষা করা পাড়ার মুখগুলি তাঁর চেনা ছিল। সেই সব মুখে কিছু উত্তেজনা, প্রশ্ন।

টিনের দরজা ঠেলে, বাড়ি ঢোকার আগে, কপালের ঘাম কাচিয়ে নিচ্ছিলেন সতীপ্রসন্ন। তাঁর পাঞ্জাবি আর গেঞ্জি ঘামে ভিজে বুক পিঠে লেপ্টে গেছে। ডান হাতে দুধের বোতলের হিম।

সমরকে তিনি চেনেন। পাড়ার বারোয়ারি দুর্গা-কালী পুজো, দশ রাতব্যপী সিনেমা প্রদর্শনী (ক্লাব উন্নয়ন প্রকল্পে) আর অন্যান্য নানা উৎসব ও জনকল্যাণের চাঁদায় সমরের ভূমিকা অগ্রবাহিনীর।

ওর বাবা সুভাষ রায় তাঁর থেকে অনেক ছোট। সমর একটি লম্বা শাদা ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে মেনতুর টালির বাড়ানো শেডের নিচে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে অধীর, টুকলাল-বাবু, ফিরিঙ্গি-কেষ্ট, স্বাধীন, সফি, আসলাম। আরও হয়ত কেউ কেউ ছিল।

চোখের কোণ দিয়ে এখনই সকলকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন না সতীপ্রসন্ন। হাওয়ায় একটা গুমোট আটকে আছে। আকাশে ভেসে থাকা একটুকরো কালো মেঘ পাখা ছড়াচ্ছে।

প্রায় তাঁর পেছন পেছনই টিনের দরজা ঠেলে সমর ঢুকল। পেছনে বাকিরা, ধীরে। গেট ঠেলার শব্দে একটু যেন বা চমকেই পেছনে ফিরলেন সতীপ্রসন্ন। সমর তেমনভাবে কোনো চাঁদা বা উৎসবের আয়োজন ছাড়া তো আসে না এ বাড়িতে।

মেঘলা পারিপার্শ্বিকের ভেতর মুখগুলি ম্লান হয়ে ফুটে আছে।

জ্যাঠামশাই একটা কথা ছিল—বলতে বলতে সমর যেন তাঁকে পেরিয়ে লম্বা বারান্দায় আসা কাঠের দরজার সামনে দাঁড়াল।

এত ভোরে কি কথা থাকতে পারে, হয়তো কোনো আর্থিক সাহায্য—মড়া পোড়ানো অথবা মেয়ের বিয়ের দায়ভার। নাকি কোনো মেলার উদ্যোগ—যা আজকাল প্রায়ই হচ্ছে, অথবা রাজনৈতিক চাঁদা? ক্যালেণ্ডারের তারিখের হিসেবে সামনা সামনি এখন তো কোনো পুজো নেই।

বল, বলে, সতীপ্রসন্ন সমরের মুখোমুখী। মুঠোবন্দী কাচের দুধ-বোতল টেবিলের ওপর একটু জোরেই—ঠক শব্দ করে রাখলেন।

এভাবে হবে না, ভেতরে গিয়ে বলতে হবে। বলে সমর টিন মোড়া কাঠের পাল্লা ঠেলে ভেতরে।

একটা সই দিতে হবে।

কিসের সই?

মাঠপুকুর বুজিয়ে জমি করে বিক্রি করার কথা হচ্ছে। অনেক টাকার লেনদেন। এমন কি আপনার এলাকার নেতারাও কেউ কেউ টাকা খেয়েছে।

চমকানোর নানান স্তর থাকে। সতীপ্রসন্ন তার কোন স্তরে ছিলেন বাইরে থেকে বোঝা গেল না। বারান্দায় ততক্ষণে সুধাপ্রসন্ন, মনোরমা, অপরাজিতা।

একলা দীপেশ এক ক্যাসেট থেকে অন্য ক্যাসেটে সুর বদল করছিল। টেপরেকর্ডার চলার শব্দে, হঠাৎ থেমে আবার চলতে শুরু করা ক্যাসেটের বিচিত্র আওয়াজে এ বাড়ির বাতাস ধ্বনিময়, সুরময় হয়েছিল।

আমার এলাকার নেতা মানে—সতীপ্রসন্ন সমরের কথায় মনে মনে উত্তর হাতড়ালেন। যার কথা সময় বলতে চাইছে, সে কি সমরের নেতা নয়?

পুকুর ভরাট করে জমি বানিয়ে ফেললে আসলাম সফিদের বড় অসুবিধে হবে—সমর গলার স্বরে উত্তেজনার এক শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যাচ্ছিল।

পুকুরটা তো যোগেনদের, সে তো টালিগঞ্জে থাকে।

এখন পুকুর ভাগের। তিন শরিকের মামলা। কিন্তু এলাকার কম করে দশ/বারো ঘর মানুষ, তাদের তো এই পুকুরটুকুই সব। তার ওপর জমি হলেই তো এখন মাল্টিস্টোরিড। হয় কুন্দলিয়া, ছাবারিয়া, দাগা, নয় কোনো বাঙালি কোটিপতি প্রোমোটার হয়ে বসবে। কংক্রিটের থামের ওপর সরু মতন আকাশ খাবলানো বাড়ি। স্কোয়ার ফুটের মাপের খাঁচা। আমাদের ক্লাবের কাছাকাছি খেলার মাঠ, বাচ্চাদের জন্যে একটা কমপ্লেক্স—এসবই তো ক্লাব তৈরি করার সময় পরিকল্পনায় ছিল। আমরা তো শুধু প্রতিষ্ঠা দিবসে, পতাকা উত্তোলনের সময় শুধুই প্রতিশ্রুতি দি জ্যাঠামশাই। কিন্তু কিছুই তো হয় নি। আমরাও পারি নি। আগের জমানাতেও হয় নি। তার ওপর যদি একটা ওরকম বাড়ি ওঠে—

স্টাডিতে ওদের নিয়ে বসালেন সতীপ্রসন্ন। এখন তাঁর জানলা দিয়ে হাত বাড়ানো সবুজ পেঁপের ডালটি নেই। বর্ষার জল আসবে, এই যুক্তিতে মনোরমা মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে।

তিনি জানেন সুকান্তপল্লী ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে ক্যারামের ঘুঁটির শব্দ, শিশুদের বিনাপয়সায় পোলিও ভ্যাকসিন, স্বাধীনতা দিবসে পাঁউরুটি-দুধ বা কখনও স্বেচ্ছা-রক্তদানের হুল্লোড় ছাড়া কিছু দিতে পারে নি।

সফি আর আসলাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, ঘরের বাইরে। সতীপ্রসন্ন ওদের ভেতরে ডাকলেন।

পিচ রাস্তার ওপর একটা টিউবওয়েল, কখন ভাঙে; কখন ঠিক থাকে —সফি এই প্রথম কথা বলল। ছাব্বিশ/সাতাশ বছরের গালে পাতলা পাতলা দাড়ি। একটু যেন ভেতরে ঢোকানো চোখ, কিন্তু উজ্জ্বল। হাড়ের চওড়া কাঠামোয় মাংস কম। সংখ্যালঘু হিসেবে বোধহয়, এমনিই ওরা অনিশ্চিত সংশয়ে থাকে।

ঘরের ফ্যান সতীপ্রসন্নর পাঞ্জাবি শুকিয়ে দিচ্ছিল। সকলের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে সতীপ্রসন্ন একটা যেন আলো দেখতে পাচ্ছিলেন।

আমরা পাম্পে জল তোলা বন্ধ করে দিয়েছি জ্যাঠামশাই। এ নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাস ক্যামপেন, সই কালেকশানে বেরিয়েছি, নিয়ে লোকাল এম. এল এ আর কাউন্সিলারের কাছে জমা দেব। টাকা খাওয়া-খাওয়ির ব্যাপার আমরা জানি। আপনার আমার চেনা মানুষ, বড় বড় কথা বলা, আদর্শের বুকনি ঝাড়া অনেক ওজনদার চাঁই এর পেছনে, তবুও ব্যাপারটা ছাড়ব না। শেষ দেখব।

সতীপ্রসন্নর মনে পড়ল সমররা কয়েকদিন আগে তাঁর বাড়ির দেয়ালে লিখছিল—'কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আশার আলো বক্রেশ্বর রক্ত দিয়ে গড়ে তুলব।' যারা পয়সা নিয়ে পুকুর বুজিয়ে জমি লেন-দেনের এই নোংরা খেলা খেলছে, তারাও কি এই শ্লোগানে বিশ্বাসী? সমরের সুরে তিনি কি কোনো ডিসিডেণ্ট ভয়েস পেলেন?

ফুলস্কেপ কাগজের বয়ানটা পড়লেন সতীপ্রসন্ন। দুটি কপি—একটি এ ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের কাছে যাবে, অন্যটি এম. এল. এ-র কাছে। তারপর মেয়র আর পুর মন্ত্রীকেও জানাব আমরা, আরও

হুটো সিগনেচার ক্যামপেন করে। আলাদা আলাদা। দু একটি নাম এই সই করা কাগজে দেখতে পাবেন—এমন আশা করেছিলেন সতী-প্রসন্ন। যাঁরা রাজনৈতিক শ্লোগানে অন্তত সমরদের কাছাকাছি, তা অনুপস্থিতই থেকে গেছে।

অনেক টাকা-পয়সার ব্যাপার জ্যাঠামশাই। সমর কি দীর্ঘশ্বাস চাপল, না রাগ!

সতীপ্রসন্ন পুরো নাম সই করতে করতে সমরের দিকে একবার তাকালেন। বুঝতে পারলেন না।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সমর।—যাই জ্যাঠামশাই, অনেক-গুলো সই করাতে হবে। আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন। আপনি 'পরিবেশ' বের করেন। আপনি জানেন এভাবে ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি জায়গায় বাড়ি, কোনো স্পেস নেই। কি অবস্থা হবে আমাদের! রুজু রুজু জানলা করার উপায় নেই। খোলা যাবে না। খেলবে না হাওয়া-বাতাস, আলো।

এই প্রথম পরিবেশ নিয়ে নিজের পাড়ায় একটা মর্যাদাসূচক সম্বোধন পেলেন সতীপ্রসন্ন। এর আগে সমররা কোনোদিন তো 'পরিবেশ' নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলে নি। তিনি যেন এক সম্মানজনক দূরত্বে ছিলেন। বড়জোর পাড়ার রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যায় প্রধানঅতিথি। বা বার্ষিক স্পোর্টসে ফর্সা জামা-কাপড় পরে ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের পাশে বসে গলায় মালা পরা, বানানো হাসি হাসা। এবং কিছু বানানো বাণী—অমুক করতে হবে, তমুক করতে হবে। বাঁধা-গৎ সব, যা বড়ই ক্লান্তিকর।

কিন্তু কিছু করার নেই সমর। যেন বা স্রোতের উল্টোদিকে গিয়েই বললেন সতীপ্রসন্ন। আর তারপর আবারও আগের কথার জের টেনে—এই শহর যেভাবে বাড়ছে, তুমি আমি কেউ একে ঠেকাতে পারব না। গঙ্গানদী তো শহরটাকে একদিকে আটকে দিয়েছে। ফলে সল্টলেক, বাগুইহাটি, দমদম কলকাতা হলো। জোকা, ব্রহ্মপুর, ঠাকুরপুকুর, সরশুনা, হরিদেবপুর, শিবরামপুর, সুভাষগ্রাম—সব নাম

খবরের কাগজে ফ্ল্যাটের বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে কলকাতা বলে জেনে গেলাম। মাল্টিস্টোরিড বাড়ি হবে। সবুজ কাটা পড়বে। পুরনো ঐতিহাসিক বাড়ি ভাঙা যাবে। আমরা সংকুচিত হব, গণ্ডী ছোট হবে—কিছু করার নেই সমর। এত মানুষ যাবে কোথায়! তবে তার মধ্যেই পরিবেশটা বাঁচানো দরকার।

তবু কিছু একটা তো করতে হবে জ্যাঠামশাই। বাবার কাছে শুনেছি, কালীঘাটের বাড়ি থেকে এখানে যখন আপনারা বাড়ি করে চলে এলেন, তখন খালি পেয়ারা বাগান, পুকুর, আশফলের বাগান, বাঁশ-ঝোপ। কবরখানা, বেজি, শেয়াল, সাপ, বাঘডাসা। কালীঘাটের বাড়িতে আপনাদের সকলের কুলোচ্ছিল না।

সুভাষ সব জানে, ও তো ছোটবেলা থেকেই আমাদের দেখছে। ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। ট্যাপ ওয়াটারের লাইন নেই। বাস রুট হয় নি। বাস বলতে চোদ্দ নম্বর। চণ্ডীতলায় নেমে হেঁটে আসা। তখন কালীঘাটের বাড়ির অনেকেই পিকনিক করতে আসত এ বাড়ির আশে-পাশে. ফাঁকা মাঠে। কিভাবে এই এলাকা ভর্তি হয়ে গেল! কত সাপ মেরেছে তোদের জ্যেঠিমা, আমি। বড় বড় বিছে। শেয়ালে ছাগল বাচ্চা নিয়ে যায়। পোষা হাঁস মুরগী ধরে টানে। সন্ধে ছটা সাতটার পর ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর এখন পুকুরে টান পড়েছে! মানুষ সেখানেও বাড়ি করবে। বহুতল বানাবে।

তবু তো ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স, যে ক'দিন পারা যায় রোদে জলে হাওয়ায় থাকা। তার ওপর টাকা খেয়ে এমন করা! সমরের গলায় সতীপ্রসন্ন চমকে উঠলেন। তাঁর মনে হলো দশ বছর ধরে 'পরিবেশ' করে তিনি খুব একটা ভুল পথে এগোন নি।

আসুন না জ্যাঠামশাই, পুকুরটা দেখে যান। এক রাতে কি অবস্থা হয়েছে! বোধহয় আসলামই বলল তাঁকে।

সমর, সফি, আসলাম, টুকলাল, বাবু, ফিরিঙ্গি-কেষ্ট—সকলের সঙ্গে সতীপ্রসন্ন হাঁটছিলেন। তাঁর বাড়ি থেকে মাঠপুকুর দু' মিনিট।

সামনে এসে দাঁড়াতে মেঘলা ছায়ায় দেখতে পেলেন পুকুরের সবুজ

জল অনেকটা নিচে। শালের খুঁটি, পুরনো, ক্ষয়ে যাওয়া ইট বের করা ন্যাড়া ঘাটলার দাঁত, সব দেখা যাচ্ছে। বড় জোর পায়ের কড়া ডোবে এমন জল থিতিয়ে আছে। তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়া আকাশ। ঘন মেঘ আকাশ ছেয়েছে।

সতীপ্রসন্নর মনে পড়ল দেশের বাড়িতে পুকুর শুকিয়ে যেত গরমে। তখন কাদায় আটকনো জিওল মাছের সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যেত হারিয়ে যাওয়া কাঁসার বাটি-ঘটি, ভাঙা দইয়ের হাঁড়ি, মাটির কলসির গলা, রুপোর মল বা চুটকি, হয়ত বহুকাল আগে খুলে পড়ে যাওয়া সোনার আংটিও।

দশ/বারো ঘর মানুষের কেউ কেউ পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে। সেই গোরু বাঁধা গাছের নিচে বসে আছে কেউ কেউ। গেল বছরই রাস্তা চওড়া করার জন্যে মাটি ফেলে ফেলে মাঠপুকুরের অনেকটা ভরাট হয়েছিল। মাটির পর শাল বল্লা পুঁতে পুঁতে রাস্তাকে পোক্ত করা।

দু'টি হাঁস স্থির হয়েছিল জলের ওপর। এই উঁচু মাটিতে কাল রাতের জলস্রোতের চিহ্ন। এখানে ওখানে কাদা। পিছল। জল বহনের গভীর দাগ পড়ে গেছে মাটির বুকে। কাঁকর, খোয়া বেরিয়ে পড়েছে কোথাও কোথাও বুক চিরে, জল যাওয়ার ফলে। জায়গায় জায়গায় থিতিয়ে থাকা নরম, নিরীহ কাদা।

পুকুর ধারে অনেক মানুষ। যেমন মাছ ভেসে উঠলে হয়। চিলি-বিলি। হাতজাল, খ্যাপলা-জাল, আঁটল, গামছা নিয়ে ক্রমাগত হুড়োহুড়ি জলে। তাতে এক ধরনের কোলাহল থাকে। অনেকটা যেন উৎসবের মেজাজ। রোদে জলে কাদায়, মৎস্য শিকারে। আজ সব চুপচাপ। স্থির।

স্টুডেন্টস হলে 'ক্যালকাটা : মাই লাভ'-এর সেমিনার মনে পড়ে গেল সতীপ্রসন্নর। এমন অনেক কাজ তাঁরা করবেন বলে কথা দিয়ে-ছিলেন। তামাকের ধোঁয়া, সাব অলটার্ন, ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স, অ্যাটমসফেয়ার, পলিউশন—ইত্যাদি ভারি ভারি পণ্ডিতি শব্দে চারপাশ থম হয়েছিল। এমন কি কফি হাউসের মালিকানা বদলের

ব্যাপারে তাঁরা সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন—একরম কথাও হয়েছিল। কোনো কাজ আজ পর্যন্ত বাস্তবে হয় নি। কলকাতা কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে। সবুজে সবুজে ছেয়ে থাকবে চারপাশ। পরিষ্কার রাস্তা-ঘাট, গঙ্গায় পলিউশান নেই। পরিচ্ছন্ন আকাশ। কারখানার চিমনির ধোঁয়ায়, বাস-ট্যাক্সির পেট্রল-ডিজেল মবিলের পোড়া কলুষে, হর্নের শব্দে দম আটকে আসে না। মাথা ছিঁড়ে যায় না। বিয়ে বাড়িতে পুজোর প্যাণ্ডেলে মাইকের অত্যাচার বন্ধ—এসব ভাবতে ভালো লাগে।

ঠাণ্ডা, জোলো হাওয়ায় জুড়িয়ে দেয় শরীর। কালো মেঘটি বৃষ্টি হলো। সতীপ্রসন্ন ভিজে যাচ্ছেন। মুষল ধারার বর্ষণে সমর, সফি, আসলাম—সবাই ভিজছে। ওরা সারাদিন-রাত আজ এখানে থাকবে। সবাই মিলে আর পুকুরের জল ছেঁচতে দেব না। এই বৃষ্টিতে পুকুরের জল বেড়ে উঠবে। ভরে উঠবে কানায়-কানায়। মানুষ জীবন পাবে। জলের আর এক নাম জীবন।

সতীপ্রসন্ন দেখতে পাচ্ছিলেন কোথাও কোনো পতাকা নেই। শুধু লাল-কালোতে লেখা, দরমার ওপর সাঁটা পোস্টারের অক্ষরগুলি বৃষ্টিতে ভিজে উঠে কেমন যেন সেঁতিয়ে ধেবড়ে গেছে। 'মাঠপুকুরকে জবর দখল করে বে-আইনী বহুতল করতে দেব না।' 'মাঠপুকুর বাঁচান, এলাকার পরিবেশ ও শান্তিরক্ষা করুন'—এমন সব শব্দমালারা বৃষ্টি ভিজেও সমান উজ্জ্বল, বোধহয় জীবনের উত্তাপে—এমনটি মনে হলো তাঁর এখন। গোটা জলাভূমি ঘিরে আজ যেন জীবনেরই উৎসব। এইসব মূক মুখগুলি পতাকা হয়ে গেছে।

বৃষ্টির দাপটে, হাওয়ার ছাটে ভিজতে ভিজতে সতীপ্রসন্ন দেখতে পেলেন মাঠপুকুরের সবুজ জল একটু একটু করে ইটের ঘাটলা ঢেকে দিচ্ছে। ক্যাচকোচ ক্যাচকোচ করতে করতে গোটা তিনেক শালিক বুঝি উড়ে গেল। জল বাড়ছে। হাঁসেরা তীব্রতর করছে গতি। তাদের সাঁতারে আনন্দের ছন্দ।

প্রকৃতি মাঠপুকুর ভরিয়ে দিচ্ছে। তার চারপাশে অনেক মানুষ।